পঞ্চম অধ্যায়

সাহিত্যে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি

ষোড়শ শতকে পশ্চিম কামরূপে কোচ শক্তির অভ্যুত্থানের আগে থেকেই সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত। সমগ্র কামরূপ সহ প্রান্ত উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশ কোচ শাসনাধীন হয় — যদিও সে শাসন দীর্ঘদিন বলবৎ ছিল না। রাজন্য শাসিত কোচবিহারে সাহিত্য সৃষ্টির ধারাবাহিকতা সুদীর্ঘকাল অব্যাহত ছিল। ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিও ছিল বিস্তীর্ণ কামরূপের সঙ্গে অন্বিত। গৌড়ের পাল ও সেন রাজাদের মত কামরূপের রাজারাও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। রাজসভাতে কবিরত্নের পোষণ ছিল আভিজাত্যের পরিচয়। 'তাম্রশাসন' গুলো তারই প্রমাণ যা থেকে কবিদের বাক্-চাতুর্য, সৃজন ক্ষমতা, অলংকার প্রয়োগ ও নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পাশাপাশি রাজন্যবর্গের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য প্রীতির বিষয়টি স্পষ্ট হয়। কামরূপের ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত জনপদগুলোতে সংস্কৃত শাস্ত্র, পুরাণ, মহাকাব্য প্রভৃতির চর্চা হত। উত্তরকালে আঞ্চলিক ভাষায় সাহিত্য চর্চার বিষয়টি প্রাধান্য পায়। সেক্ষেত্রে অনেকে সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হন। কোচ-রাজবংশও তার ব্যতিক্রম নয় বরং বলা যায় ধারাবাহিকতায় উত্তরসূরী হিসাবে সভাকবি সহ সৃজনশীলতার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। 'উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার', 'কোচবিহার সাহিত্যসভা গ্রন্থাগার'-এ সংরক্ষিত পুঁথির সংখ্যায় তা অনুমিত হয়। ধারাবাহিকভাবে চারশ' বছর ধরে কোচ-মহারাজারা পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। মূলতঃ পুরাণ শাস্ত্রাদির অনুবাদ কর্মে সভাকবিরা নিমগ্ন থাকলেও ভিন্ন ধারার মৌলিক কিছু সাহিত্য সৃজন কর্মও সম্পন্ন হয়। যে সব সৃজনে আঞ্চলিক ভাষার উপস্থিতিও লক্ষণীয় এবং এতদঞ্চলের সাহিত্য-ভাষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোচ-রাজবংশের সারস্বত সাধনার সম্ভার পরিমাণগত প্রাচুর্যে যা বিপুল হলেও দুঃখের বিষয় সৃষ্টির তুলনায় সংগৃহীত এবং সংরক্ষিত পুঁথিপত্র বা মুদ্রিত গ্রন্থের সংখ্যা সন্তোষজনক নয়। রাজন্যবর্গের সাহিত্য সাধনার আগ্রহ যতটা ছিল, গ্রন্থাদির উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ, তালিকা প্রণয়ন বা উত্তরকালে মুদ্রণের এবং প্রচারের অভাব ছিল। ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা, দক্ষ ব্যক্তির অভাবও একটি কারণ। অনেক

রচনাই হারিয়ে গেছে কিংবা ব্যক্তিগত সংগ্রহে অন্তরালে থেকে গেছে। কিছু বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বিক্ষিপ্তভাবে সংরক্ষিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রাজন্যশাসিত কোচবিহারে মূলত অনুবাদ সাহিত্য কর্মই রাজপৃষ্ঠপোষকতায় সম্পন্ন হলেও মৌলিক রচনার ক্ষেত্রটিও নিভৃতে রচিত হয়। অনেকেই ব্যক্তিগত পরিসরে নিরলস সাহিত্য সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। তারই ফলশ্রুতি অজস্র পুঁথি পরবর্তীকালে উদ্ধার হয়। যদিও ধরে নেওয়া যায় যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে কিংবা ভৌগোলিক কারণে অনেক পুঁথি কালের স্রোতে হারিয়ে গেছে। পরবর্তীকালে সংগৃহীত পুঁথিগুলির যথাযথ মূল্যায়ন কিংবা সাহিত্য গুণের মূল্যায়ন, বিচার বিশ্লেষণ হয়নি। মূল ধারার সাহিত্য কৃতিতেও যথাযথ গুরুত্ব বা স্থান পায়নি। কোথাও কোথাও শুধু উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। তবে বলা যায় মধ্যযুগের কামতা-কোচ রাজ্যে সাহিত্যচর্চা রাজন্যবর্গের যে গৌরবময় ভূমিকা ছিল তা অনস্বীকার্য। যা উত্তর-পূর্ব ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি ধর্মীয় ক্ষেত্রেও অপরিহার্য ছিল।

মহারাজা বিশ্বসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেই শিবমন্ত্রে দীক্ষা নেন। তৎকালীন কোচ রাজ্যে তখন ছিল আদি কৌম বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বসবাস। মহারাজা বিশ্বসিংহ ছিলেন হরিদাস মন্ডল নামক 'মেচ' দলপতির সন্তান। সিংহাসনে আরোহন করেই মহারাজা বিশ্বসিংহ নিজেকে 'রাজবংশী' হিসাবে ঘোষণা করেন। বহু জনগোষ্ঠীর সমাবেশে এই 'রাজবংশী' হিসাবে ঘোষণার মধ্যে ছিল রাষ্ট্রনৈতিক দূরদর্শিতা। কোচ, মেচ, কাছারি, গারো, টোটো, রাভা প্রভৃতি কৌম জনগোষ্ঠীর মাঝে অপেক্ষাকৃত প্রাগসর 'রাজবংশী' জনগোষ্ঠী হিসাবে ঘোষণা মহারাজা বিশ্বসিংহের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। সেইসঙ্গে কামতা রাজ্যের 'খেন' বংশীয় নীলাম্বরের পতন সেখানে সদ্য ঘটেছে। ধর্মীয় ভাবনাও সক্রিয় ছিল মহারাজা বিশ্বসিংহের ভাবনায়। কারণ ততদিনে আর্য ভাষা ও সংস্কৃতির স্রোত এই ভূখণ্ডে সম্পূর্ণ মাত্রায় প্রবেশ করেছে। বিভিন্ন মত ধর্মের প্রভাবে ধর্মবিশ্বাস, কর্মানুষ্ঠান, ভাষা ও সংস্কৃতি বিবর্তিত হতে শুরু করেছে। আর্য ভাষা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসার কামরূপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ঘটেছে। স্বাভাবিকভাবে সঙ্গতি রেখে মহারাজা বিশ্বসিংহ সমস্ত প্রজাকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াসে নতুন পরিচয় গ্রহণ করেন। বলা যায় শৈবধর্মে দীক্ষা নিয়ে হিন্দুধর্মের ধারা সম্পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি। মহারাজা বিশ্বসিংহের কোচ-রাজবংশ প্রতিষ্ঠার আগেই কামরূপে বাংলার এবং উত্তর ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে উচ্চবর্ণের এবং

অভিজাত জনের আগমন শুরু হয়েছিল। তাদের সঙ্গে আদি কৌম জনগোষ্ঠীর ভাষা সংস্কৃতির অন্বয় ঘটে ধর্মচেতনা ও ধর্মাচরণেও সংশ্লেষণ ঘটে। উদ্ভব হয় মিশ্র সংস্কৃতির। দরঙ্গ রাজবংশাবলীর বিবরণে জানা যায় যে রাজ্যলাভের আগে এবং পরে তিনি স্বয়ং একাধিকবার দুর্গাপূজা করেছিলেন। সে পূজাতে তিনি 'বলি'ও দিয়েছিলেন। রাজ্যে বেদ ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পুরোহিত থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজে কৌম সংস্কার মতে দেবীর পূজা করেন।[১]

কৌম জীবন থেকে আগত কোচ-রাজবংশের মহারাজারা প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। দেবালয় প্রতিষ্ঠা বা সংস্কার, তীর্থক্ষেত্র, ভূমিদান, শিক্ষাবিস্তার, সুকুমার শিল্পকলার চর্চা প্রায় উদ্ভব কাল থেকেই শুরু হয় এবং অব্যাহত থাকে। মহারাজা নরনারায়ণ দশভূজার পূজা প্রবর্তন, সুপ্রসিদ্ধ কামাখ্যা মন্দির পুনর্নির্মাণ, বাণেশ্বর শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা, হাজোর হয়গ্রীব মাধবের প্রাচীন মন্দিরের সংস্কার সাধন এবং পূজার্চ্চনার জন্য দেবোত্তর জমি প্রদান করেন। শংকরদেবের প্রভাবে রাজ্যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারে উদ্যোগী হন। বিষ্ণুরূপী 'শ্রীশ্রী মদনমোহন' প্রতিষ্ঠা হয়। আবার তিনি নিজস্ব কৌম রীতিনীতিও অনুসরণ করেন। বস্তুত সেই ধারাই কোচবিহারে অক্ষুণ্ণ থাকে। যে-সব কৌমের সমন্বয়ে 'রাজবংশী' সমাজের উদ্ভব সে-সব কৌম গোষ্ঠীগুলির অস্তিত্ব কখনই পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়নি। বরং বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির পাশাপাশি বসবাসের ফলে এবং অভিবাসিত উচ্চবর্ণের প্রভাবে রাজবংশীদের ধর্ম-কর্ম-ধ্যান-ধারণা এক ভিন্ন রূপ পরিগ্রহণ করে যা পুরোপুরি 'আদিম'ও নয়, আবার 'স্মৃতি শাসিত'ও নয়। এই 'রাজবংশী' সমাজ বস্তুত বহুলাংশে রক্ষণশীল হলেও পরিবর্তন প্রবণতা থেকে মুক্ত নয়। সাম্প্রতিককালে এই প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। সেটা ধর্মাচরণে শুধু নয় সংস্কৃতি, সমাজ জীবনের ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

কোচ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা বিশ্বসিংহ এবং তার পুত্র মহারাজা নরনারায়ণ এক বিশেষ ধর্মীয় ভাবনায় রাজবংশী সমাজের সমন্বয় সাধন করেন। কোচ-মহারাজারা কামতা রাজ্য ও পার্শ্ববর্তী কামরূপ এলাকার ধর্মীয় চেতনা ও প্রভাবকে গুরুত্ব দিয়েছেন। আবার কৌম জনগোষ্ঠীর আদিম কৌম রীতিনীতিকেও অস্বীকার করেননি। বরং রাজ্যের বিস্তৃত এলাকার কৌম জনগোষ্ঠীগুলিকে এক সমন্বয় ভাবনায় সমন্বিত করার প্রয়াসেই 'রাজবংশী' জাতি নাম পরিগ্রহণ করেন। যা রাজ্যের পক্ষে সহায়ক হয়ে উঠে। ধর্মীয় ভাবনাতেও তাই এক সমন্বয়ের

ভাবনাই সক্রিয় থেকেছে। আর্য, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেও আদি কৌম রীতিনীতিকেও অনুসরণ করা হয়েছে ঐতিহ্য পরম্পরায়। যা আজও কোচবিহারে অনুসৃত হতে দেখা যায়, বিশেষ করে রাজবংশী সমাজ ও ধর্মীয় জীবনে। কোচ রাজন্যবর্গের ধর্মাচরণ তাই নিছক প্রথানুসৃতি ছিল না। এর মধ্যে মনন ভাবনা বিধৃত হয়ে আছে। বর্ণহিন্দুর সমস্ত আচার নিয়মকে তাঁরা অন্ধভাবে কিংবা নির্বিচারে গ্রহণ করেননি। পুরোহিত তন্ত্রের প্রতি আনুগত্য ছিল। তা বলে প্রজানুপুঞ্জের ধর্ম, সংস্কারকে সমূলে এবং সবলে উৎখাত করার জন্য কখনই কোন মহারাজা অতিমাত্রায় উৎসাহী হয়ে ওঠেননি। বরং বরাবর সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। শংকরদেবের আগমন এভাবেই ঘটে। আবার প্রজানুপুঞ্জের ধর্মাচরণের প্রতি তারা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন — এমন কথাও বলা যাবে না। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে - সহিষ্ণুতা এবং উদারতা।[২] বিভিন্ন ধর্মমতের সমন্বয়। যা কোচবিহার রাজ্যের প্রাচীন ঐতিহ্য। সেটা মদনমোহন মন্দিরে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ধর্মের বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের (ভেড়াঘর পোড়ানো, দোলসওয়ারী, বিষহরি, মাড়েয়া গান, রাস, মদনকামের অনুষ্ঠান, জন্মাষ্টমী পালন, দধি কাদো খেলা) রীতি সংস্কারে প্রতীয়মান। স্বাভাবিকভাবে এই ধর্মীয় সংস্কৃতি ভাবনা রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতিতে সরাসরি পড়ে। যার প্রতিফলন আমরা আজও দেখতে পাই। রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতি ধীরে হলেও ধাপে ধাপে আজকের সময়ে এসে পৌঁছেছে নিজস্ব কৌম পরিচয় অক্ষুণ্ণ রেখেই।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে 'দরঙ্গ রাজবংশাবলী'তে উল্লেখিত অহোম রাজ্যের বিরুদ্ধে মহারাজা নরনারায়ণের যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দ্বারা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করানো হয় কিন্তু যাত্রা শুরু হওয়ার পর —[৩]

> ''প্রথম নিশাত দেখা দিলা সদাশিব।
> বোলে আপোনার নীতি এবিলিহি কিয়।।
> কছারীর মতে এভা করিও নাচন।
> তোর জয় হৈব কৈলো স্বরূপ বচন।।
> এহি বলি মহাদেব অন্তধান ভৈলা।
> চেতন লভিয়া রাজা সম্ভার ছুপাইলা।।
> সোনকোষ নদীর তীরত থানা গারি।

পাতিলা নাচন যত আনিয়া কছারী।।
হংস পার পদ ভাত মহিষ শূকর।
কুকুরা ছাগল উপহার নিরন্তর।।
পাতিলা নাচন তথা মাদল বজাই।
সবারে মাজত তুলিলন্ত দেওধাই।।
পূজা পাই তুষ্ট ভৈলা যত দেবগণ।
দেওধাই বুলিলন্ত স্বরূপ বচন।।

পূজার পুরোহিত দেওধা অর্থাৎ দেউসী রাজবংশী সমাজের পুরোহিত। দেবতার সন্তুষ্টির কথা তিনিই রাজাকে জানিয়েছিলেন। এখনও জলপাইগুড়ি, কোচবিহারের রাজবংশী সমাজে এবং কোনো কোনো মন্দিরে এঁরাই পূজার্চনা করে থাকেন। বর্তমানে জল্লেশ্বর শিবমন্দিরে ব্রাহ্মণ পূজারী নিযুক্ত হলেও অতীতে এরাই পূজা করতেন। পূজার উপকরণ বা উপচারে একেবারে আদিম সমাজের হাঁস, পায়রা, কুক্কুট বা কুঁকড়া। 'ভাত' এবং 'মদ্য' দেওয়া হয়েছিল ভোগ্য রূপে। পূজার সময় দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য মাদলের তালে তালে চলেছিল কছারীদের নৃত্য। তারপর যোড়শোপাচারে দেবী চণ্ডিকার পূজাও করা হয়। পূজা শেষে মহারাজ সাত দুয়ারের ভোট কছারীদের ডেকে নির্দেশ দিলেন — [৪]

"গোঁহাই কমল আলী মধ্যে সীমা করি।
উত্তরের ফালে আছে যতেক কছারী।।
সেহি ফালে দেবালয় আছে যত যত।
কোচে-মেচে পূজিবেক মোহর-বাক্যত।।
দক্ষিণর ফালে পূজা ব্রাহ্মণে করিব।
এহি নিবন্ধনে সবে ধর্ম প্রবর্তিত।।"

'গোঁহাই কমল আলী'র উত্তরে প্রাচীন কামতা রাজ্যের কিছু অংশ অর্থাৎ ভুটানের সন্নিহিত অঞ্চল। কোচ-মেচ অধ্যুষিত এই অঞ্চলে পূজার অধিকার লাভ করে কৌম জনগোষ্ঠীর লোকেরাই এবং দক্ষিণ অংশে দেবার্চ্চনায় ব্রাহ্মণদের পূজার অধিকার দেওয়া হয়। 'আদিম' এবং 'পৌরাণিক' রীতিনীতি পূজা পদ্ধতির সঙ্গে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের পূজার্চ্চনাকে স্বীকৃতি দিয়ে সমন্বয়ের পথকে

উন্মুক্ত করেছিলেন। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রজাপুঞ্জের কিংবা কৌম জনগোষ্ঠীর ধর্মাচরণের প্রতি কোন ঔদাসীন্য দেখাননি।[৫] রাজার ধর্ম কিংবা প্রজার ধর্মের মধ্যে কোনও বিরোধ তৈরি হয়নি। এইভাবে মহারাজা বিশ্বসিংহ মহারাজা নরনারায়ণ দূরদৃষ্টি নিয়ে হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা যেমন করেন তেমনি সমাজ ও সংস্কৃতির সংস্কার করেন। মহারাজা বিশ্বসিংহের রাজবংশী পরিচয় গ্রহণের মধ্য দিয়ে এই সমন্বয়কামী যাত্রার সূচনা হয় এবং কোচ মহারাজগণ সবাই ভিন্ন ভিন্ন ধর্মবিশ্বাসকে (শংকরীয় বৈষ্ণব ভাবনা, ব্রাহ্মধর্ম) পৃষ্ঠপোষণ করলেও মূল সমন্বয়কামী ভাবনা থেকে সরে আসেননি। ফলশ্রুতিতে রাজবংশী জনগোষ্ঠী বিভিন্ন কৌম জনগোষ্ঠীর সমন্বিত হয়ে সুসংগঠিত হয়ে ওঠে এটা যেমন বলা যায় তেমনি সমাজ সংস্কৃতি ও ধর্মীয় চেতনাতেও সুসংবদ্ধ হয়ে প্রাগসর হয়।

কোচ শাসনাধীন সময়কালে দুইটি ধারায় সাহিত্য সৃজন কর্ম সম্পন্ন হয় ধরা যেতে পারে। প্রথর্ম পর্বটি ষোড়শ শতাব্দীর সূচনা কাল থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত আর দ্বিতীয় পর্বের সূচনা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়কালে। প্রথম পর্বের সাহিত্য সৃজন কর্ম আবার তিনটি ধারায় সম্পন্ন হয়। ক) সংস্কৃত মহাকাব্য, পুরাণ প্রভৃতি অনুবাদ খ) আঞ্চলিক ভাষায় এবং সংস্কৃতে বিভিন্ন আখ্যান কাব্য ও অন্যান্য গ্রন্থাদি রচনা গ) রাজ্যের বাইরে রচিত গ্রন্থাদির পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের ও উৎকর্ষের প্রয়াস।

দ্বিতীয় পর্বে মূলত: মৌলিক রচনাকার্যই সম্পাদিত হয়। যেমন মঙ্গলকাব্য, পুরাণ ও মহাকাব্য অবলম্বনে রচিত বিবিধ আখ্যান কাব্য, লীলা ও ভজন পদ, কৃত্রিম গদ্যে রচিত কয়েকটি নাটক, ব্রতকথা, পাঁচালী, উপকথা। শতাব্দীতে সাহিত্য সাধনা বহুমুখী হয়ে ওঠে। এ যুগে বেশ কয়েকটি মৌলিক রচনার উল্লেখ পাওয়া যায় — মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ নিজে একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত মানুষ ছিলেন। মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গীত সংগ্রহ, মহারাণী বৃন্দেশ্বরীর 'বেহারোদন্ত' উল্লেখযোগ্য। এই সময়ের অপর দুটি উল্লেখযোগ্য রচনা হল —

ক) গোসানীমঙ্গল - রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী (এটি বর্তমানে মুদ্রিত)

খ) কালিকাপুরাণ - শ্রী ব্রজসুন্দর (সাহিত্য সভায় সংরক্ষিত পুঁথি নং - ১৬)

বিংশ শতাব্দীতে কোচ রাজ্যের সাহিত্য সংস্কৃতির ধারাটি ভিন্নখাতে প্রবাহিত হয়। বলা যেতে পারে বাংলা সাহিত্য ধারায় মিশে যায়।

প্রথম পর্বের সাহিত্য সৃজনে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার মধ্য দিয়ে ধর্মীয় সংস্কৃতির সম্প্রসারণ ঘটে বলা যায়। এই প্রয়াস রাজ পৃষ্ঠপোষকতায় বেগবান হয়। কিন্তু কখনও এতদঞ্চলের আদিম কৌম জনগোষ্ঠীগুলি বিরোধের জায়গা তৈরি হয়নি। ধীরে হলেও আর্যীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে একথা অনস্বীকার্য।

উত্তর-পূর্ব ভারতে 'অহোম'দের রাজত্ব শুরু হয় ত্রয়োদশ শতকে। অহোমদের আগমনে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিন্যাসের যুগান্তর পরিবর্তন সূচিত হয়। পাশাপাশি প্রান্ত উত্তরবঙ্গ সহ কামতা-কামরূপের জনজীবনও আলোড়িত হয়। প্রভাবিত হয় আর্য ভাষাভাষী জনস্রোতে। উল্লেখ্য গুপ্ত অধিকারের সময় থেকে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের আগমন শুরু হয়। উত্তরবঙ্গও এই ধারার বাইরে ছিল না। অহোম রাজন্যবর্গের সৌজন্যে শুধু ব্রাহ্মণ নয়, কায়স্থ সহ বিভিন্ন বৃত্তিধারী সম্প্রদায়েরও আগমন ঘটে কামতা রাজ্যে। ফলে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কৃতির মধ্যে পরিবর্তন সূচিত হয়।[৬] সেটা হল —

১) পূর্বতন জাতিভেদ জ্ঞানমুক্ত সমভূমিতে উচ্চ-নীচতা পরিস্ফুট হতে থাকে।

২) লোকায়ত জীবনের দিক হইতে অধিকতর অর্থবহ পৌরাণিক ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটে।[৭] তার ফলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও গ্রহণ বর্জন, আত্তীকরণ, অনুকরণ, আরোপণ, সংমিশ্রণ ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় এতদঞ্চলের কৌম জনগোষ্ঠীগুলির জীবনচর্যা সহ সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবন অন্যভাবে আবর্তিত ও প্রসারিত হতে শুরু করে। ষোড়শ শতকে কোচ শক্তির অভ্যুত্থানে সেই ধারা প্রক্রিয়া বেগবান হয়। বলা যেতে পারে মহারাজা বিশ্বসিংহ এই সুদূরপ্রসারী ভাবনাকে মাথায় রেখে 'রাজবংশী পরিচয়' গ্রহণ করে হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

কোচ-মহারাজাদের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় 'হিন্দুধর্ম' তথা বৈদিক সংস্কৃতির প্রসারে বিশেষ সহায়ক হয়। পার্শ্ববর্তী অহম রাজন্যবর্গের সৌজন্যে বহু ব্রাহ্মণ, কায়স্থদের যেমন আগমন ঘটে তেমনি কোচ মহারাজারাও বিশেষ করে বিশ্বসিংহ ও নরনারায়ণও বহু ব্রাহ্মণকে গৌড়, কনৌজ, মিথিলা থেকে নিয়ে আসেন। ব্রহ্মোত্তর জমি প্রদান সহ বিভিন্ন মন্দিরে পূজা অর্চনার দায়িত্বও অর্পণ করেন। পাশাপাশি রাজসভাতে পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের সভাকবি হিসাবেও স্থান দেন। মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণ কবিন্দ্র পাত্রকে মন্ত্রী অবধি করেছিলেন। রাজ্যে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। পণ্ডিত পুরুষোত্তম সিদ্ধান্ত বাগীশ, পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ, কবিরাম সরস্বতী, বিপ্র বিশারদ,

শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ, অনন্ত কন্দলী, সভাকবি রাম রায় প্রমুখ পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ সাহিত্য সৃজন কর্মে ব্যাপৃত ছিলেন। মহাপুরুষ, শংকরদেব তো ছিলেন অভিভাবক স্বরূপ। পণ্ডিতবর্গ রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, শাস্ত্রাদি অনুবাদ করে ব্রাহ্মণ্য ও বৈদিক সংস্কৃতির প্রসার ঘটান। সাহিত্য, সৃজনের গুরুত্বপূর্ণ এই কাজের সমান্তরালে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটে। কোচ রাজ্যে হিন্দুধর্মের রীতিনীতি, বিশ্বাস, মননভাবনা বিস্তার লাভ করে। আদি কৌম জনজাতিদের আদিম প্রাকৃত ভাবনার সঙ্গে আর্যীয় সংস্কৃতির আত্তীকরণ, সংমিশ্রণ, গ্রহণ বর্জন প্রক্রিয়া তরান্বিত হয়। রাজ্যে ধর্মীয় চেতনায় সমন্বয় ভাবনার সম্প্রসারণ ঘটে। কোচ মহারাজারা যেমন কৌম জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার ভাবনা রেখেছিলেন তেমনি প্রজাবৃন্দের মধ্যে পার্শ্ববর্তী রাজ্যের ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে পণ্ডিতবর্গের শাস্ত্র, পুরাণাদি অনুবাদ কর্মে অধিক পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। যে কারণে কোচবিহারের সাহিত্য সাধনার প্রথম পর্বে (ষোড়শ শতাব্দী ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত) সংস্কৃত পুরাণ শাস্ত্র ও মহাকাব্যগুলিকে আঞ্চলিক সাহিত্যের ভাষায় অনুবাদ কর্মই বেশি সম্পন্ন হয়। মৌলিক সাহিত্য ধারাটিও ছিল দেব মাহাত্ম্যকেন্দ্রিক। অবশ্য প্রাচীন ও মধ্যযুগে সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য সম্পূর্ণতই ধর্মাশ্রিত ছিল। সেখানে মৌলিক সৃজনও ছিল ধর্মরীতিকে আশ্রয় করে। কিন্তু কোচবিহারের সাহিত্য চর্চার প্রথম পর্বে ধর্মাশ্রয়ী অনুবাদ কর্মের মধ্যে মহারাজা তথা পারিষদ বর্গের সুদূরপ্রসারী ভাবনা ছিল। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি তথা হিন্দুধর্মের বিস্তার ঘটিয়ে প্রজা সকলকে ধর্মীয় মনোভাবে রাজার অনুকূলে একাত্ম করে সুদৃঢ় করে তোলা।

এই সমন্বয় ভাবনা আজও রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতিতে দৃশ্যমান। শৈব, শাক্ত, ধর্মবিশ্বাসের পাশাপাশি বৈষ্ণবীয় ভাবনার প্রতি অনুরাগ কিংবা পীর দেবতার উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য প্রদানের মধ্যে সেই সমন্বয় ভাবনারই প্রকাশ ঘটে। আবার কোচবিহারের ‘বড়োদেবী’ পূজায় দশমীর দিন শূকরের মাংস ও হাড়িয়া নিবেদনের মধ্যেও সমন্বয়ের সেই ভাবনাই আজও প্রবহমান। এই ভাবনাকে মাথায় রেখে মহারাজা বিশ্বসিংহের শৈবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ ও ‘রাজবংশী’ হিসেবে নতুন পরিচয় ঘোষণার তাৎপর্য। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সাহিত্য রচনায় পুরাণ, শাস্ত্রাদি অনুবাদ কর্মে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান তারই অনুষঙ্গ।

দ্বিতীয় পর্বে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত

কোচবিহারের সাহিত্য সাধনার ধারা ভিন্নখাতে প্রবাহিত হয়। মৌলিক সাহিত্য ধারার সূচনা হয় বলা যায়। পুরাণ ও ক্লাসিক্যাল চর্চার পরিবর্তে ইতিহাসধর্মী রচনা, আখ্যান, গীতিকাব্য রচনার সঙ্গে লীলা ও ভজন পদ, কৃত্রিম গদ্যে রচিত নাটক, ব্রতকথা, পাঁচালী, উপকথা ও মঙ্গলকাব্যের অনুকরণে আখ্যান কাব্য। এই ধারার রচনাগুলিতে তৎকালীন সময়কালের সমাজ ধারা পদ্ধতির বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে আসে। এক্ষেত্রেও মহারাজাদের সাগ্রহ লাভ করে। মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণ তো বিশেষ পণ্ডিত মানুষ ছিলেন। রাজন্য শাসিত কোচবিহারের সাহিত্য সাধনার ইতিহাসে মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ এক বিরাট এবং বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। মহারাজা স্বয়ং শিক্ষিত, বিদ্যোৎসাহী এবং সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। সঙ্গীত-নৃত্য চারুকলা প্রভৃতিতে তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের বিশিষ্ট রচনা 'গীতাবলী'। স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্যে ও মৌলিক চেতনায় সমুজ্জ্বল 'গীতাবলী'র রচনা। তিনি একাধিক অনুবাদ কর্মও সম্পন্ন করেন। তাঁর লিখিত উপকথায় কাহিনিগত চমৎকারীত্ব ততটা না থাকলেও ধর্ম সম্পর্কহীন মানব রসসিক্ত আখ্যান রূপে উল্লেখের দাবি রাখে। এই পর্বে রাজ অন্তঃপুরিকার অনেকে সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হন। এ প্রসঙ্গে মহারাণী বিন্দেশ্বরী দেবীর নাম যেমন উল্লেখ করতে হয় তেমনি পরবর্তীকালে সুনীতি দেবী এবং নিরুপমা দেবীর নামও আসে। এই পর্বের সাহিত্যধারায় মৌলিক আন্তর চেতনার প্রকাশ যেমন ঘটে তেমনি প্রচলিত চলমান ভাষা, শব্দের সংযোজনও ঘটে।

• লোকসাহিত্যে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি

ভাষাবিদদের মতে ‘চর্যাপদ’-এর পর বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ প্রাচীন নিদর্শন ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যগ্রন্থ। কবি মালাধর বসু ১৪৭৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। তিনি গৌড় রাজসভার সভাকবি ছিলেন। ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক আখ্যান কাব্য। উত্তরবঙ্গের ‘জাগ গান’-এর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সাদৃশ্য লক্ষ করার মত। উত্তরের গ্রাম্য লোক কবি রতিরাম দাসের ‘জাগ গান’, ‘মদনকামের গান’ হিসাবেও সমধিক পরিচিতি। এখনও কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা এলাকায় মদনকাম গানের আসর বসে। বাংলা লোকসাহিত্য গবেষণায় এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধার। জাগ গান আজকে লুপ্তপ্রায়। আর্থসামাজিক কাঠামোয় উত্তরবঙ্গের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় সম্পদ বাঁশকে ঘিরে জাগ গান, মদনকাম পূজার প্রসার। রাধাকৃষ্ণের প্রেম জাগ গানে নিতান্ত সাধারণ মানুষের প্রেম, জৈবিক প্রেমে অন্বিত হয়েছে। এখানে রাধা শাক তোলে। কানাই বঁড়শিতে মাছ ধরে ‘বোল্লার চাক’ দিয়ে। আবার ইংরেজ সরকারের ইজারাদার দেবীসিংহের কৃষক নির্যাতনের কাহিনিকেও তুলে ধরে। রতিরাম দাসের ‘জাগ গান’ বস্তুত কামনা বাসনা জাগরণের আদি রসাত্মক গান নয়, অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত ও শোষিত শ্রেণির জেগে ওঠার ও জেগে থাকার গানও বটে। একে জাগরী সঙ্গীত বলা যায়। সেইসঙ্গে সমাজ সংস্কৃতিরও দলিল বটে।

জাগ গান বা মদনকামের গান রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির অংশ। বাঁশ পূজার সঙ্গে অন্বিত। চৈত্র মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে মদনকামের পূজা রাজবংশী সমাজে এখনও প্রচলিত। অতীতে জাগ গান ও মদনকামের পূজা রঙ্গপুর, ধুবরী, কোচবিহার, জলপাইগুড়ির বিস্তৃত অঞ্চলে হত। বিভিন্ন আচার সংস্কারের মধ্যে দিয়ে একাধিক দেবতার নামে (৭টি - শালশিরি মহারাজা, গারাম, সন্ন্যাসী, কালি, তিস্তাবুড়ি, বিষহরি, মাদারপীর স্থানভেদে অন্য দেবতা সংযুক্ত হয়) উৎসর্গীকৃত বাঁশের প্রতীককে দেবতা হিসাবে পূজা করে রাজবংশী সমাজের পুরোহিত। মদনকাম তথা বাঁশপূজা বিশ্বব্যাপ্ত ধারারই একটি আঞ্চলিক রূপভেদ। জাগ গান এই মদনকাম পূজা সম্পর্কিত নৈবেদ্য সূচক গান। গানের বর্ণনে বাঁশের জন্মকথা, মৃত্তিকা সৃজন, কার্পাস খেতি, কাপড় তৈরির আদি কথা সুর করে গাওয়া হয়। সঙ্গে বাজনা ঢাক, ঢোল, কড়কা, সানাই ও কাঁসি

সহযোগে বাজনা ও নাচ। বাঁশ হাতে নিয়ে ভক্ত্যারা নাচ করে। মদনকামের গানে ভয়ভক্তির চেয়ে মানবিক প্রেমের প্রকাশ বেশি করে ঘটেছে।

ভাওয়াইয়া গানের সংগ্রহ ও সংকলনে প্রথম স্থান পেয়েছে জাগ গান। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে (১৩১৫ বঙ্গাব্দ) পণ্ডিত যাদবরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন রংপুরের জাগ গান সংগ্রহ করে রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। সংগৃহীত ও সংকলিত গানগুলির রচয়িতা ছিলেন ইটাকুমারী গ্রামের রতিরাম দাস।

জাগের গান আবার কথা-ভাষ্য অনুযায়ী দুই শ্রেণি পর্যায়ে বিভক্ত। মোটা জাগের গান খানিকটা অশালীন হিসাবে চিহ্নিত আর সরু জাগের গান লীলা জাগ, কানাই ধামালী (কৃষ্ণ ধামালী) হিসাবেও পরিচিত। কানাই ধামালী বা লীলা জাগ আবার কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত — ১) রাধার শাক তোলা ২) কৃষ্ণের ধোরে মাছ মারা ৩) কৃষ্ণের বড়শীতে মাছ ধরা এবং ৪) রাস। এই রাস পর্যায়ে তৎকালীন সময়ের সমাজ ও অর্থনীতির ছবি সহ সংস্কৃতির বিষয়ও ধরা পড়েছে। সেইসঙ্গে কৃষি সমাজের অবস্থা, অর্থনৈতিক পীড়ন, শোষণের বিষয়গুলি সংযোজিত হয়েছে। কানাই ধামালী বা জাগ গান রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির অংশ এবং রাজবংশী সমাজের সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতির বিষয়গুলি পরিস্ফুট হয়।

ড. দীনেশ চন্দ্র সেন মন্তব্য করেছেন যে ‘‘সেই সময় হইতে আগত এক শ্রেণির গান আমরা রঙ্গপুর, কোচবিহার, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে পাইতেছি — তাহার নাম কৃষ্ণ ধামালী। ... প্রাচীন রাজবংশী জাতি ও যোগীরা বাংলাদেশের নানা স্থানে সেই প্রাচীন গীতিকাগুলি এখনও রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। শুল্কা কৃষ্ণ ধামালীকে সুন্দর করিয়া সাধুভাষায় প্রবর্তিত করিয়া কবিতা মণ্ডিত করিয়া চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তন লিখিয়াছিলেন। যদি কৃষ্ণকীর্তন না পাইতাম তবে বুঝিতাম গীতগোবিন্দ ও কৃষ্ণ ধামালীর পরেই হঠাৎ চণ্ডীদাসের অভ্যুদয় কি করিয়া হইয়াছিল।’’[৮]

জাগ গানের সঙ্গে মদনকাম তথা বাঁশ পূজার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট। ইন্দো-মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর জনজাতির কাছে বাঁশ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বাঁশ শিবের প্রতীকে পূজা পায়, যা বৃক্ষ পূজার নামান্তর। জাগ গানের আখ্যানে মৃত্তিকা সৃষ্টি, বাঁশের উদ্ভব, কার্পাস খেতি, সুতা কেটে কাপড় তৈরি রাজবংশী সমাজের প্রাচীন রীতি। দেবতার বিন্যাসেও পরিবার তন্ত্র কিংবা অন্য দেবতাকে গ্রহণ (পীর দেবতা) করার মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভাবনাকে প্রতিপন্ন করে। আজও

আমরা রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্রিয়াক্ষেত্রে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলার নস্য শেখ মুলসিম সমাজের অংশগ্রহণ দেখি। আবার পীর দেবতার প্রতি অনুরক্ত রাজবংশীদের মধ্যে বিদ্যমান। দেবতাকে মানবরূপে পরিবারের একজন ভাবা রাজবংশী সমাজের সুপ্রাচীন প্রথা। শিব যেমন কৃষক দেবতা থেকে গ্রাম দেবতা হয়েছেন তেমনি জাগ গানের আখ্যানে রাধা লাফা শাক তোলে ঘরের মেয়ের মত, কৃষ্ণও বড়শিতে মাছ ধরতে বসে। রাধাকৃষ্ণের কথোপকথন হয়ে ওঠে মানবিক গ্রাম্য যুবক-যুবতীর প্রেম আখ্যান। যা ভাওয়াইয়া সংগীতের সুরে কথায় বহুভাবে উচ্চারিত হয়ে আসছে সুপ্রাচীন কাল থেকে। আবার ধর্মীয় ভাবনায় শৈব, শাক্ত ,তান্ত্রিকতার আভাসও পূজায় বিদ্যমান। সেখানে শব্দ ব্যঞ্জনে (অশ্লীল) তান্ত্রিকতা কিংবা উগ্রতার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। এই জাগ গান, মদনকামের পূজা রাজবংশী সমাজের উর্বরা সংস্কৃতির পরিচায়কও বটে। সমকালীন সমাজ ব্যবস্থার পাশাপাশি অর্থনৈতিক অবস্থার ছবিও প্রতিফলিত হয়েছে জাগ গানের আখ্যানে। কৃষক সমাজের উপর দেবী সিংহের অত্যাচার, শাসন শোষণের বিষয়গুলি সহ কৃষকদের দুঃখ দুর্দশার বর্ণনাও পাওয়া যায়। স্বাভাবিকভাবে ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে জাগ গানের গুরুত্ব সমাজবিজ্ঞানের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ।

জাগ গান কিংবা কৃষ্ণধামালী গানগুলি প্রাচীন কামরূপ কোচ-কামতা এলাকার আদি জনগোষ্ঠী রাজবংশী সমাজের গান। এতদঞ্চলের ভৌগোলিক প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, রাজবংশী জনগোষ্ঠীর জীবনদর্শন, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস, আচার সংস্কার সমস্ত কিছুর প্রতিফলন ঘটেছে গানের কথায়। আঞ্চলিক ভাষা শব্দের সংযোজন ঘটেছে। নাচের ভঙ্গি, যাদুক্রিয়া, উপকরণ (মুখোশ, বাঁশ) ব্যবহারের মধ্যে আদিম উর্বরা সংস্কৃতি ও প্রাকৃত বিশ্বাসকে সূচিত করে। পাশাপাশি প্রাগসর সমাজের ভাবনা, লোকধর্ম, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, সমমাজদর্শন সবকিছুই কৃত্যাদির মধ্যে নিহিত আছে। আবার প্রতিবাদী চেতনার ভাবনাও 'রাস' পর্বে ধরা পড়েছে। অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থাও বর্ণিত হয়েছে দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতায়। তাই জাগ গান নিছক কামনা বাসনার গান নয়, জাগরণের গান। তদুপরি লোকশিক্ষার বাহনও বটে। সাহিত্যের বিচারে মোটেই উপেক্ষার নয়। লোকসাহিত্যের উপাদানে সময়কালকে চিহ্নিত করে সমাজ ও সংস্কৃতির বিষয়গুলিকে অনুধাবন করা যায়। জাগ গানেও তাই —

পারে না ঘাঁটায় চল্‌তে ঝিউরী বউরী।
দেবীসিংহের লোকে নেয় তাকে জোর করি।।

পূর্ণ কলি অবতার দেবীসিংহ রাজা।
দেবীসিংহ-এর উপদ্রবে প্রজা ভাজা ভাজা।।

পেটে নাই অন্ন তাদের পৈরানে নাই বাস।
চামে ঢাকা হাড় কয়খান করি উপবাস।। [৯]

রাজার পাপে প্রজা নষ্ট দেওয়ার নাই জল।
মাঠে ধান জ্বলিয়া গেল ঘরে নাই সম্বল।
বচ্ছরে বচ্ছরে এলা হইতেছে আকাল।
চালে নাই খ্যাড় কারো ঘরে নাই চা'ল।।
মাও ছাড়ে বাপ ছাড়ে ছাড়ে নিজের মাইয়া।
বেটা ছাড়ে বেটি ছাড়ে নাই কারো মায়া।[১০]

জাগ গান, কৃষ্ণধামালী গানগুলি প্রাচীন কামরূপ-কামতা অঞ্চলের গান। এ অঞ্চলে অতীতে উৎকৃষ্ট বাঙ্গা অর্থাৎ কার্পাস তুলার চাষ হত। তারই প্রকাশ ঘটেছে গানে —

কি কারণে হে কিশান নিশ্চিন্তে বসিয়া
টারি চায়া বাঙ্গার খেতে কিষাণ করো যায়া।
ভাদর মাসে ঘোর রৈদে বাঙ্গার চক্র ফুটে
তাক দেখিয়া কিষাণের বেটার মুখের হাসি ফোটে।
কেরকেয়া ধুনিয়া বাঙ্গার গড়েয়া নিল পাইজ
এক সূতা ছাড়িয়া দিল আটিয়া কলার মাইজ।
মথুরার হাটত্ সূতা নিয়া বেড়ায় বেচেয়া
জোলা সব দেখিয়া সূতা নিল তো কিনিয়া।
সূতা পায়া জোলা সব আনন্দিত মন
আপোনার বাড়ি বুলি করিল গমন।
কি করিস রে জোলানি তুই নিশ্চিন্তে বসিয়া
সব চরকি ধরি শীঘ্র টানা খসাও আসিয়া।[১১]

বন্দনা অংশে যথারীতি দেববন্দনা না করে কামাখ্যা দেবী ও গোসানীমারীর উল্লেখ করা হয়েছে। রাধাকৃষ্ণ হয়ে উঠেছে মানব-মানবী। চরিত্র সৃষ্টিতে নতুন রাধাকৃষ্ণের জন্ম হয়েছে। পরিবেশের সঙ্গে সুন্দর সাযুজ্য রেখে হালকা রসের মিশ্রণে কাহিনির ভাব, ভাষা ও সাহিত্য এক সুন্দর লোকায়ত রূপ পেয়েছে। আঞ্চলিক শব্দ প্রয়োগ ও ব্যবহারিক সামগ্রীর উল্লেখ করে জীবনচর্যাকে পরিস্ফুট করেছে।

রাজবংশী জনগোষ্ঠী আদি কৌম পরিচয় নিয়ে বর্তমানে দ্বিমতের অবকাশ নেই। প্রাক্ আর্য যুগ থেকেই এই জনগোষ্ঠী নিজস্ব সমাজ সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। ধর্মীয় সংস্কৃতিও সময়কালের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধারা মতের সম্মুখীন হয়েছে। গ্রহণ বর্জন, আত্তীকরণের মধ্য দিয়ে আর্যীকরণের অংশীদার হয়েও কৌম চরিত্রটি যেমন বর্জন করেনি তেমনি জীবনচর্যার অনুষঙ্গ গুলিকে ঐতিহ্য পরম্পরায় বহন করেছে। পরবর্তীকালে কোচ-রাজবংশ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে নতুনভাবে সমন্বিত হয়ে সুসংগঠিত হয়েছে। কিন্তু কৌম রীতিনীতি এযাবৎ বর্জন করেনি। উপরন্তু ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অনেক কিছু গ্রহণ করে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির অংশ হয়েছে। সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও যোগ্যভাবে সমন্বয় সাধনে সক্ষম হয়েছে। রাজবংশী জনগোষ্ঠীর ভাষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য প্রাচীনত্বের পরিচায়ক। তারই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় পুরাণ, উপপুরাণ, শাস্ত্রাদি সহ বিভিন্ন কৃতিবিদদের সৃজন সাহিত্যে। ভাষা সম্পর্কে বলা যায় 'রাজবংশী' আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় একটি পূর্ণাঙ্গ ভাষা। রাজবংশী ভাষার মৌলিক শব্দাবলীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উচ্চারণ লক্ষণীয় এবং সেগুলি একবিংশ শতাব্দীতেও জীবন্ত ও ভাস্বর। বহু মৌলিক রাজবংশী শব্দ ভোট-চীনীয় ভাষা বংশের অন্তর্গত বোড়ো ভাষার চিহ্ন বহন যেমন করে তেমনি বহুসংখ্যক আগন্তুক শব্দ - সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, ইংরাজি, পর্তুগীজ, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার শব্দভাণ্ডার দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে। রাজবংশী জনগোষ্ঠীর লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখার (প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা, ছড়া, পাঁচালী, লোককাহিনি সঙ্গীতের প্রভৃতি) সম্ভারে নিজস্ব বাকশৈলী, ধরন, অলঙ্কার, ব্যঞ্জনা সহ ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি ধরা পড়ে। সেইসঙ্গে সমাজ ও সংস্কৃতির বিষয়গুলি উঠে আসে।

শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেনের সৌজন্যে পূর্ববঙ্গের লিখিত ও অলিখিত সাহিত্য কিছুটা গুরুত্ব পেলেও উত্তরবঙ্গের সাহিত্য সৃজনশীলতা কোথাও কোথাও শুধু উল্লেখিতই হয়েছে, বিশ্লেষণ

বা মূল্যায়নের পর্যায়ে বিশেষ গুরুত্ব পাইনি। এই সৃজনশীলতা কালের অমোঘ নিয়মে বেশ কিছু হারিয়ে গেছে, কোথাওবা মৌখিক লোকসাহিত্যের আদলে যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত হয়েছে এবং অল্প সামান্যই লিখিত রূপ পেয়েছে। সামগ্রিকভাবে যা বাংলা সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি বলা যায়। ১৮৭৬-৭৭ খ্রিস্টাব্দে বিশিষ্ট ভাষাবিদ স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসন অবিভক্ত উত্তরবঙ্গের রংপুর, দিনাজপুর এবং কোচবিহার, কামরূপের গ্রাম গঞ্জ থেকে রাজবংশী সমাজের ছড়া, গান, পাঁচালী, ছিল্কা (শ্লোক) সংগ্রহ করে ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে 'মানিকচান্দ রাজার গান' নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এরপর ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয় অতিরিক্ত কিছু গান (তিন যোগী ভিখারীর কাছ থেকে) সংগ্রহ করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তৎকালীন রংপুরের মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য সংগৃহীত এই গানগুলি ড. দীনেশচন্দ্র সেন এবং বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়দ্বয় সংকলন করে বই আকারে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'গোপীচন্দ্রের গান' নামকরণ করে প্রকাশ করেন। এরপর ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে আবার তিনটি পর্বে প্রকাশ পায়। প্রথম ভাগে ছিল মৌখিক সংগ্রহ ও লোকসাহিত্য থেকে পাওয়া 'গোপীচন্দ্রের গান'গুলি। দ্বিতীয় ভাগে ছিল গোপীচন্দ্রের পাঁচালী, রচয়িতা ছিলেন ভবানী দাস। আর তৃতীয় ভাগে গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস পর্বের গানগুলি রচয়িতা ছিলেন সুকুর মামুদ। তারপরে আরো কিছু গান সংগ্রহ করে নলিনীকান্ত ভট্টশালী এবং বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশ করেন 'ময়নামতীর গান' নামে একটি গ্রন্থ। একই বিষয়কে অবলম্বন করে একাধিক গ্রন্থ প্রকাশ পায় পাশাপাশি সময়ে মৌখিক ভাষ্যকে সংগ্রহ করে। যা পরবর্তীকালে সাহিত্যের অংশ হয়ে ওঠে। গাথা বা গীতিকা হিসাবে যোগীগণের মুখে মুখে এগুলি ছিল আখ্যানমূলক লোকগীতি। এই গীতিকাগুলি গুরুবাদী নাথ সম্প্রদায়ের যোগীগণের। এতে প্রেম ভালোবাসার বিষয় ছাড়ায় লোক ঐতিহ্যের বিষয়বস্তুও নিহিত ছিল। এই গীত গাথাগুলি থেকে তৎকালীন সমাজের বেশ কিছু বিষয় প্রতিভাত হয়। উল্লেখ্য রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মানুষজন তখন সংখ্যাধিক্য ছিল এবং তাদের মধ্যে নাথ ধর্মের প্রভাব যথেষ্টই ছিল। ময়নাগুড়ি এলাকায় কয়েক দশক আগেও নাথ যোগীদের 'লাউয়ের বস' নিয়ে গান করে ভিক্ষা করতে দেখা যেত। যা যুগীর গান হিসাবে রাজবংশী সমাজে প্রচলিত। ভিক্ষা করার বিশেষত্ব হল ভিক্ষা দেওয়ার সময় যোগী (যুগী) পেছন ফিরে

থাকবে অর্থাৎ ভিক্ষার পরিমাণ সে দেখতে পারবে না। এটাই ছিল প্রচলিত রীতি। তাছাড়া ময়নাগুড়ি নামটির সঙ্গেও জনশ্রুতিতে 'ময়নামতী মাও' যুক্ত হয়ে আছে। গানের কথাতেই সে সময়ের সামাজিক অবস্থার ছবি পাওয়া যায়। নাথ গীতিকার একটি অংশ গোরক্ষনাথ-মীননাথের কাহিনি 'গোরক্ষবিজয়', 'মীন চেতন' হিসাবেও আখ্যায়িত। আরেকটি অংশ গোপীচন্দ্রের গান বা ময়নামতীর গান। নাথ বিশ্বাসের ধারায় এই দুই কাহিনী এতদঞ্চলে বহুল প্রচলিত ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য নাথ গীতিকাগুলি ব্রাহ্মণ্য প্রভাব ও সংস্কৃতি মুক্ত গীতিকা। গ্রামের যোগী সাধুরা ঘুরে ঘুরে গান শুনিয়ে প্রচারের কাজটি করতেন।

এছাড়াও রাজবংশী সমাজে গোরখনাথ ঠাকুরের পূজাকে ঘিরে এক ধরনের গান গোন্নাথ মাগার গান (গোরখনাথের গান) হিসাবে এখনও প্রচলিত। অতীতে বহুল প্রচলিত থাকলেও বর্তমানে উত্তরবঙ্গের কিছু কিছু জায়গায় শোনা যায়। রাখাল বালকেরা গোরখনাথের পূজা উপলক্ষে রাতে গান করে বাড়ি বাড়ি মাগন করত। হাতে থাকত লাঠি কিংবা বাঁশের দণ্ডে পাথর ঢুকিয়ে মাটিতে আছাড় মেরে মেরে বিশেষ শব্দের সঙ্গে সুর করে গান করত। গোল করে ঘুরে ঘুরে দলের একজন গান ধরত — বাকিরা 'ধুয়া' ধরত। পূজা হত মাঠে। গোরখনাথ রাজবংশী সমাজে গবাদি পশুর রক্ষাকর্তা হিসাবে কোথাও শিবের সঙ্গে কোথাওবা কৃষ্ণের সঙ্গে অন্বিত হয়েছে। কোচবিহারের এক-এক এলাকায় একেকভাবে মান্যতা পেয়েছে। পরবর্তীকালে শিব ও কৃষ্ণের ব্যাপক প্রসারে গোরখনাথের প্রভাব রাজবংশী সমাজে হ্রাস পায়। গানের সূত্রতেও সেটা বোঝা যায়। 'এ শিবে' অথবা 'এ থুবে' এই স্মরণ উচ্চারণ দিয়েই মাগনের দল গান শুরু করে। গোরখনাথের গানগুলি 'হাইচাও গান' হিসাবেও সমধিক পরিচিত। বিশেষ করে কোচবিহার জেলায়। আবার গানগুলি অঞ্চলভেদে রূপান্তরিতও হয়েছে। গানে সামাজিক, ঐতিহাসিক ঘটনা, এমনকী রাজনৈতিক বিষয় সহ দেহতত্ত্ব, আখ্যানমূলক, সমাচারের বিষয়গুলিও লোক কবির রচনায় ধরা পড়েছে। গানগুলি মৌখিক সাহিত্যেরই একটি অংশ স্বাভাবিকভাবে তাই প্রাচীনত্ব খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তবে গানগুলি পয়ার ছন্দের গাওয়া হয় এবং সংস্কৃত ও তৎসম শব্দের মিশ্রণ বিদ্যমান। এই গানগুলির মধ্য দিয়ে নীতি বার্তা, চাষাবাদের বিষয়, ঘর নির্মাণের পদ্ধতি, মনঃশিক্ষার বিষয়গুলিও সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। সর্বোপরি রাজবংশী সমাজ জীবনের চিত্রাবলী খুঁজে পাওয়া যায়। গানগুলিতে ছন্দ, লয় ব্যবহারে কোথাও কোথাও অসঙ্গতি থাকলেও

পুরাণ কথা, ধর্মতত্ত্ব, জীবন চর্যা কিংবা বিশ্বাস ভাবনার দিক থেকে লোক পুরাণের প্রেক্ষিতে গানগুলি রাজবংশী সমাজ জীবনের দলিল। মজা আনন্দের বিভাবে বালকেরা গানগুলি পরিবেশন করে। আর এর মধ্যেই লোক সাংবাদিকতা, শিক্ষার বিষয়টি প্রসারিত হয়। এরকমই একটি গান যেখানে পাট চাষের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে —

থুবে/সুবে/শুভে
মাগি বলে মুনসা মোর বচন ধর।
হেগুাবন মারিয়া পাটাবন কর।।
এক চাষ করিয়া দুই সারি মই।
তবু না উঠিয়া গেল কেল্লা দুবার বই।।
দুই চাষ করিয়া চার সারি মই।
তবু না উঠিয়া গেল ভেলোয়া দুবার বই।।
আট চাষ করিয়া রে ষোলো সারি মই।
তবে তো উঠিয়া গেল কেল্লা দুবার বই।।
পাটা না ফেলেরে দিলাম আর মই।
পাটা না গাজেয়া উঠিল ধান সে ভাজা খই।
আট আঙুল পাসুন রে ভাই নয় আঙুল ডাটা।
পাটা না নিলাইতে গেল গোরকনাথের বেটা।
ফেলালো পাটা উটিল মাতে।
ভাদ্য মাস তা আগাল ফাটে।
গোর ছেয় ছেয় আগাল ছাটে।
মদ্যো খান দরিয়ায় ঢালে।
পাটা জাগাইতে নাগে কি।
আম তুলসি ভুখির মাটি।।
তিন দিন পরে দিয়া ভড়া।
পনোর অন্তরে পাটা খুয়া।।

বাপে বেটা আনলুং ধুয়া।
পাটা সুকাইতে লাগে কি
পংগোর/হাংগোর নড়ি।।
পাটা সুকিয়া ঢোপ করি
বাপে বেটা ঘর করি।
বাইসা/বায়সা ছয় মাস ছড়ি বলি।
সুবে/শুবে। [১২]

গোরক্ষবিজয় কিংবা ময়নামতীর গানে সমকালীন সমাজ ব্যবস্থার ছবি ধরা পড়েছে। যেমন - গোরক্ষবিজয়ে

"কাটিনু চিকন সূতি তোহ্মিহ বুনিবা ধুতি
হাটে নি বেচিলে পাইবা কৌড়ি।
নয়ানে নয়ানে চাহে হাত নাড়ি কথা কহ
চল যোগী আহ্মার সে বাড়ী।।" [১৩]

সুতো কেটে কাপড় বানানোর রীতি বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। রাজবংশী নারীরা তাঁতে করে নিজেদের ব্যবহার্য কাপড় চোপড় নিজেরাই বানাতেন। তাপুরি অর্থাৎ চরকা কাটা ছিল রাজবংশী সমাজ জীবনের অংশ। 'গিলাপ', 'ফোতা' কার্পাস তুলার সূতা দিয়ে বানিয়ে ব্যবহার করত। মেখলিগঞ্জ এলাকায় বহুল ব্যবহৃত ছিল মেখলী, ধোকরা। 'ধোকরা' তো ব্যবসায়িক শিল্পের পর্যায়েই তৈরি হত। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে মিলের কাপড় আমদানির ফলে এই শিল্পটি অবলুপ্ত হয়। অনেকে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত থেকেই জীবিকা নির্বাহ করতেন।

ময়নামতীর গানে যেমন পাই —

"জখন জংলানি গএনার নাম শুনিল
মএনাক নিগিয়া ভিতরে আন্দরে আগিলাত বসিবার দিল।" [১৪]

এরকমই আরেকটি গানে

"আপনার সামিক দ্যাখে নিম জ্যান তিতা।
পরার পুরুষ দ্যাখে জ্যান্ সংসারের মিতা।। [১৫]

এরকম বহু গানে রাজবংশী ভাষা শব্দের চিহ্ন শুধু নয় উপমা অলঙ্কারের রাজবংশী প্রবাদ-প্রবচনের বিষয়টিকেও উজ্জ্বল করে। গোর্খ বিজয় কিংবা ময়নামতীর গানে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের সমাজ জীবনের ছবি পরিস্ফুট হয়। বয়ন শিল্পের কথা যেমন জানা যায় তেমনি সাংসারিক কূটকচালী, পরকীয়া, ষড়যন্ত্র, অভিসন্ধি, লোভ, স্বার্থপরতা আবার লোকশিক্ষার হিতোপদেশমূলক উক্তিও পাওয়া যায়। যা রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির অতীত ভাষ্যকে নিরূপণ করে। সে ছড়া বা প্রবাদ প্রবচনগুলি আজও রাজবংশী সমাজে প্রচলিত।

“ছোট লোকের ছাওয়া যদি বড় বিসই পায়।
টেরিয়া করি পাগড়ি বান্দি ছেঞার দিগগে চায়।। [১৬]

“হাট গ্যাছেন বাজার গ্যাছেন কিনিয়া খাইছেন খই।
আমার পিতার মরণের দিন সতি গ্যাছেন কই।।” [১৭]

তুঞি হবু বটবৃক্ষ আমি তোমার লতা।
রাঙাচরণ বেড়িয়া লমু পালাইয়া যামু কোথা।। [১৮]

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও রাজবংশী সমাজ জীবনের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়। ড. সুকুমার সেনের মতে ‘মানিক দত্তের কাব্যের সব পুঁথি উত্তরবঙ্গের।’[১৯] গোসানীমারী চণ্ডীরই প্রতিভূ। চণ্ডীপূজা রাজবংশী সমাজে আজও প্রচলিত। মালদহ ও দিনাজপুর জেলায় চণ্ডীমঙ্গল পাঁচালী গানের প্রচলন যথেষ্ট। বহু স্থান নামে চণ্ডী শব্দটি যুক্ত হয়েছে। মঙ্গল চণ্ডী, বুলবুল চণ্ডী, ওলাই চণ্ডী। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতির অংশ যুক্ত হয়ে আছে।

রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় মনসামঙ্গল পদ্মপুরাণ কাব্যে। দুর্গাবর মনকর মহারাজা বিশ্বসিংহের অনুগ্রহ পুষ্ট ছিলেন। মানকরের পুঁথিটি অসম্পূর্ণ পাওয়া গেলেও কাব্যবৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল ছিল। মানকরের কাব্যগ্রন্থে শিবের বংশীবদন ও কোচ রমণীর প্রতি প্রেমের আর্তি রাজবংশী সমাজের লোক ভাবনাকে প্রতিফলিত করে। সোনা রায় দেবতারও উল্লেখ পাওয়া যায়। দুর্গাবরের ‘পোঞা বেহুলী মঙ্গল’ ও মানকরের ‘পোঞার পাঁচালী’ একটি আরেকটির পরিপূরক।

রাজবংশী সমাজে মনসা বিষহরির প্রভাব ব্যাপক। বলা যায় শিবের পরই অন্যতম দেবতা এই বিষহরি মনসা। জল জঙ্গলের ভৌগোলিক পরিবেশে মনসা-বিষহরি রাজবংশী সমাজ জীবনের অংশ। মনসা বিষহরি শুধু রাজবংশী জনগোষ্ঠী নয় উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জনগোষ্ঠী মেচ, রাভাদের মধ্যেও প্রচলিত। নিজস্ব লোকাচার ও নৈবেদ্যে পূজার্চ্চনা করে। রাজবংশী পরিবারে মনসার থান বাস্তু দেবতার মতই গুরুত্বপূর্ণ। অধিকারী পুরোহিতকে দিয়ে পূজা প্রদান কিংবা সময়ে অসময়ে নিজেরাই কাঁচা দুধ, কলা দিয়ে পূজা করে। তার জন্য তিথি নক্ষত্রের প্রয়োজন পড়ে না। যদিও শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে পূজার রীতি রাজবংশী সমাজে প্রচলিত নয়। যে কোন ধরনের শুভকার্যের আগে (অন্নপ্রাশন, বিয়ে) মনসা পূজা ও মাড়েয়া গানের আয়োজন রীতির মধ্যে পড়ে। কয়েকদিন ধরে চলে। রাজবংশী সমাজের ঐতিহ্য বলা যায়। যে কারণে মদনমোহন মন্দিরে এখনও শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মাড়েয়া গানের আসর বসে। কবি জগজ্জীবন ঘোষালের 'মনসামঙ্গল' উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজজীবনে অধিক প্রচলিত। আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতিতে এই মনসামঙ্গল কিংবা মাড়েয়া গান সুদূর অতীতকাল থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রচলিত। অন্যান্য সাংস্কৃতিক উপাদানের অনেক কিছু পরিবর্তিত হলেও একমাত্র মনসামঙ্গল বা মাড়েয়া গানের বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। এমনকী বিশ্বাস ভাবনার ক্ষেত্রেও। ওঝা, কবিরাজের প্রভাব করেছে কিন্তু এই মাড়েয়া গানের ঐতিহ্য বা পরম্পরা রক্ষায় রাজবংশী সমাজ এখনও সমান যত্নবান। 'কবি জগজ্জীবন বিরচিত মনসামঙ্গল' কাব্যে রাজবংশী সমাজ জীবনের বহু উপাদান স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। শুকটা, সিদল থেকে ঘরোয়া অনেক নিয়মাচারের কথা অবধি।

মাঝিয়াত নাই মাটি
চতুর্দ্দিকে নাই চাটি
বাহিরে না পড়ে তার পানি।।
ঘরে আছে সর্ব্বস্ব ভাঙ্গ আছে দলী দল
মৎস্যের সুকটা দলা (সিদল) সাত।। [২০]

প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গে বর্তমানে প্রচলিত 'সতী বেহুলা' পালা গানে স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায়ের খাদ্যাভ্যাসের একটি অপূর্ব বর্ণনা পাওয়া যায় —

ডিমার তরকারী রান্দিছে ঢোল মানকচু দিয়া।
অম্বল রান্দিয়া থুইছে শুকাতি মিশাইয়া।।
খেসারীর ডাইলোত দিচে শুকটার ফোরণ।
পায়েস রান্দিচে দিয়া করকচ লবণ।।
সরবতে মিশিয়া দিচে সিদলের রস।
বিয়াই খাইয়া কত করিবে সুযশ।।
ট্যাংয়া দইয়ে কটকটা চূড়া।
আটিয়া কলার বিচি খাবে চাঁদ বুড়া।।

মনসামঙ্গল সংক্রান্ত গানগুলিতে ধরা পড়েছে রাজবংশী জীবনচর্যার বিষয়, মনন ভাবনার কথা। সামগ্রিকভাবে রাজবংশী সমাজ জীবনের ছবি পাওয়া যায় এবং কয়েক শতাব্দীর এক প্রবহমানতাও ধরা পড়ে। যা মনসামঙ্গলে প্রতিফলিত হয়েছে। মনসাকে ঘিরে ষাইটল বিষহরি, গীদালি, মাড়েয়া গানও কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার প্রান্তীয় এলাকার আরেকটি ধারা। সেখানেও রাজবংশী নারীর ভাবনা, অভিপ্রায় ও সুখ-দুঃখ প্রতিফলিত হয়। এ প্রসঙ্গে ষাইটল সম্রাজ্ঞী ফুলতী গীদালির নাম করতে হয়। তিনি এই ধারাটি আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন। মনসামঙ্গল কাব্য কিংবা মাড়েয়া গানের মধ্যে রাজবংশী সমাজ জীবনের শুধু সাহিত্য সংস্কৃতির মনোভাব নয় আদিকৌম পরিচয়ও লুকিয়ে আছে। ১৯৬০ খ্রি: ড. আশুতোষ দাস ও শ্রী সুরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ‘কবি জগজ্জীবন বিরচিত মনসামঙ্গল’ সম্পাদনা করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। বলা যেতে পারে এই মৌখিক সাহিত্যকে লোকসাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করেন।

রাজবংশী সমাজে বর্তমানে যে কীর্তন প্রচলিত তা শ’দেড়েক বছর আগের বিষয়। অধিকারী পুরোহিতদের সংযোজন। তাঁরা রাজবংশী সমাজের পূজা-অর্চনার অধিকার লাভের পর গৌড়ীয় ভাবাদর্শে কীর্তনের প্রবর্তন করেন, তাঁরা গানও রচনা করেন। কারণ তাঁরাই প্রথমত: গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারের কাজটি করেছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের কৌপিন ধারণ, পঞ্চম সংস্কার, দশম সংস্কার প্রভৃতি ধর্মীয় আচার আচরণ রাজবংশী সমাজের মধ্যে প্রবর্তন তাঁদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। তার আগে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এতদঞ্চলে শঙ্করীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবই মূলত: ছিল। তারপর যোগ্য নীতিবান প্রচারকের অভাবে এই ধর্মের প্রভাব ক্রমশ অবলুপ্তির

পথে যায়। তখন রাজবংশী সমাজে প্রচলিত ছিল ‘ডাকের গান’। ডাক গান, ডাক গণনা এবং ডাকের বচন ইত্যাদি বিষয়গুলি সমাজে বিশেষ প্রচলিত ছিল। এই ডাক গান ষোড়শ শতাব্দীর বলে অনেক পণ্ডিতের মত।[২১] বর্তমান কীর্তনের আগে উচ্চকণ্ঠে সমবেত সুরে এই ডাক গান বা কীর্তন করা হত। এই গানের একটি পদ —

> ‘‘হরি তোর লীলা বুঝা ভার
> অনিত্য সংসার মাঝত হরি
> তুঞ কর্ণধার
> তোর লীলা বুঝা ভার।’’[২২]

গানের কথা ভাবে শঙ্করীয় বৈষ্ণব ধারার প্রভাব যেমন লক্ষণীয় তেমনি ‘নাম ঘোষা’র সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ। স্বাভাবিকভাবে শঙ্করীয় বৈষ্ণব মতই এই ডাক গান বা কীর্তনই ‘রাজবংশী’ সমাজের আদি কীর্তন। যা পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয়।

বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত কোচবিহার রাজ্য তথা উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের মধ্যে বহু ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন, গাথা-আখ্যান, রূপকথা-উপকথা, লোকনাট্য, লোকসঙ্গীত, পূজা-পার্বণ, ব্রতকথা ইত্যাদির ভাণ্ডারটি সুবিশাল। রাজবংশী জনজীবন থেকে উদ্ভূত এবং জীবনাশ্রয়ী এইসব উপাদান লোকসাহিত্যেরই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সুদীর্ঘকাল এইসব উপাদান অনালোচিত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এইসব মূল্যবান উপাদান উদ্ধার ও সংরক্ষণে অনেকে এগিয়ে আসেন। অনেক উপাদানই কালের স্রোতে হারিয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও বলা ভাণ্ডারটি ছোট নয়, সাহিত্যের অংশ হয়ে গবেষণার দাবি রাখে। সর্বোপরি যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এইসব উপাদানের মধ্যে তৎকালীন সময়ের রাজবংশী সমাজ জীবন, জীবনচর্যা ও মনন সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

রাজবংশী সমাজজীবনে লোকসাহিত্যের উপাদানগুলি মৌখিক সাহিত্য রূপে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। গান, কবিতা, ছড়া, শিল্লুক (শ্লোক), প্রবাদ প্রবচন এবং লোককাহিনির আদলে সেগুলিই বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বিভিন্ন পণ্ডিত বিদ্বজ্জন সংগ্রহ ও সংকলিত করেন। গ্রন্থাকার প্রকাশের মধ্য দিয়ে সাহিত্যের এই নবতম ধারাটি উজ্জীবিত হয়। এই ধারাটি অতীত কালে সাহিত্য সৃজনের অন্যতম মাধ্যম ছিল বলেই এই প্রান্তীয় অঞ্চলে অসংখ্য পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায়।

বহুসংখ্যক উদ্ধার হলেও অসংখ্য যে হারিয়ে গেছে এটাও সত্যি। মনীষী পঞ্চানন বর্মা ‘রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ’কে ঘিরে সেই ধারাটিকে বেগবান করেন। বলা যেতে পারে উত্তরবঙ্গের প্রাচীন সম্পদ হিসাবে সাহিত্যের উপাদানগুলি পণ্ডিত মহলকে সচেতন করে। ১৩২২ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ অবধি তিনি অনেকগুলি পুঁথি শুধু সংগ্রহ করেন। বহু গান, কবিতা, ছিল্কা (শ্লোক) প্রকাশের উদ্যোগও নেন। তাঁর সংগৃহীত পুঁথির মধ্যে অন্যতম ‘গোবিন্দ মিশ্রের গীতা’। পরবর্তীকালে তিনি স্বয়ং অনুবাদ কর্মের পাশাপাশি ‘রংপুরের রূপকথা’, ‘জগন্নাথী বিলাই’, ‘কথা ও ছিল্কা’ প্রকাশ করেন। নিজেও রাজবংশী সমাজ জীবনকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ‘ডাংধরী মাও’, ‘ক্ষত্রিয়দের প্রতি’, ‘বেটাছাওলার প্রতি’, ‘একটি ঘটনা’ ইত্যাদি রচনা করেন। বলা যেতে পারে তিনি লিখিত সাহিত্য ধারাটিও সচল হয়। বহু প্রাচীন, কয়েক শতাব্দী ধরে প্রচলিত রাজবংশী সমাজ জীবনের অনুষঙ্গ ছিল্কা, গান, ছড়াগুলিকে সংগ্রহ করে সাহিত্যের ভাবনাকে জারিত করেন। যা রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির একটি ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করে। বলা যেতে পারে বিগত সময়ে লোকসাহিত্যের ধারাটি বেগবান ও সজীব থাকলেও বিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে একটা নবজাগরণের মধ্যে দিয়ে বাংলা সাহিত্যের অংশভাগ হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই জর্জ আব্রাহম গ্রিয়ারসনের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। কারণ তিনি প্রথম ভাষা অনুসন্ধানে এই প্রান্তীয় অঞ্চলের রাজবংশী জনজাতির বহু গান, ছড়া, শ্লোক সংগ্রহ করে গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নেন।

রাজবংশী সমাজের লোকসাহিত্যের অংশটি সুবিস্তৃত। ছড়া, গান, ছিল্কা ছাড়াও ব্রতের কথামালায়, পাঁচালী, কাহিনিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যার মধ্যে প্রাচীনত্বের চিহ্ন যেমন পাওয়া যায় তেমনি জীবনচর্যার পদক্ষেপে সমাজ, সংস্কৃতির উপাদানগুলিকে খুঁজে নেওয়া যায়। রাজবংশী সমাজে বহু ব্রত সুপ্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। অধুনা কিছু বিলুপ্ত হলেও এখনও গ্রামগঞ্জের নারীমহল নীরবে পালন করে। ষাইটল, সুবচনী, মেচেনী, ধরমঠাকুর, ষাট পূজা, হুদোম দ্যাও, কাতি পূজা, দেউল পূজা, কাত্যায়নী ব্রত এইসব ব্রতকথা ও গানে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির বিশ্বাস-ভাবনা, অভিপ্রায় ধরা পড়েছে। প্রতিটি কৃত্যের সঙ্গে রয়েছে গান। আর এই গানেই প্রতিভাত হয়েছে কৃষি নির্ভর রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির আদি কৌম সংস্কৃতির চিহ্নাবলী। যেমন হুদুম দ্যাওর গানে আমরা পাই —

“হিল্-হিলাইছে কমরটা মোর
শির্ শিরাছে গাও
কোনঠেকেনা গেলে এলা
হুদুমার দেখা পাঁও।
পাটনীখান পড়িছে খসিয়া,—
আইসেক রে হুদুমা-দেওয়া
তোর বাদে মুই আছোঁ রে বসিয়া।।
ডিংসল্ সল্ কমরটা
তাতে নাই মোর ভাতারটা
করোঁ কি মুই কাঁয়ে বা কয়
কোন্ঠে গেলে দেখা হয়,
দেখা হালে দেহাটা জুড়ায়।।” ২৩

হুদোম দ্যাও পূজায় বৃষ্টি কামনায় নগ্নদেহে নারীর নৃত্য ও গীত প্রভৃতির মধ্যে আদিম কৌম সংস্কার ও ভাবনারই প্রকাশ ঘটেছে।

ব্রত কথা ও গানগুলিতে আদিম সংস্কৃতির উপাদান পাওয়া যায়। ধর্মবিশ্বাস, যাদুশক্তির প্রভাব, আভিচারিক ক্রিয়া, ব্রতকথা, পাঁচালীতে সংযুক্ত হয়েছে। ম্যাজিক কথা ভাবনা নৃত্যও কিছু বিষয়কে প্রকট করেছে। যেটা হুদোম দ্যাও-র নৃত্য ও হলকর্ষণের বিভিন্ন ভঙ্গীমায় প্রকাশ পায়। বট পাকুড়ের গায়ে সুতো জড়ানো, ময়না ডালকে পূজা, মঞ্জুষা বা সুকর তৈরি, ছুরি-কাটারির পূজা, উলঙ্গ নৃত্য ইত্যাদি আদি কৌম সমাজ ভাবনাকে চিহ্নিত করে। সুবচনী, ষাইটল ব্রতকথায় যেমন সৃষ্টিতত্ত্বের কথা বর্ণিত হয় সেইসঙ্গে সামাজিক রীতিনীতি, জীবন-জীবিকার বৈচিত্র্য, দৈনন্দিন আচার-সংস্কার, আহার-বিহার, বিশ্বাস, রঙ্গ-রস ইত্যাদিরও সংযোজন ঘটেছে। সমকালীন সমাজব্যবস্থার ছবিও ধরা পড়েছে। ‘উক্নাই-ছত্রকাকই’ এবং ‘দায়ো-বায়ো’ আখ্যানে যেমন দাসীকে বিয়ে করার এবং দাসীর গর্ভে সন্তান উৎপাদনের কথা জানা যায়, সেকালে দাস ব্যবসা ছিল এটাও পরিষ্কার হয়। ‘ঘট পাতালী ভাসাবার’ কথায় দেখা যায় ব্রাহ্মণ শুধুমাত্র রুচি (জাত নয়) বিচার করে শূদ্রাণীকে গৃহিণী এবং ব্রাহ্মণীকে দাসী করেছিলেন। রুচিশীলতার

গৌরবকে গুরুত্ব দেওয়া এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। 'দায়ো-বায়ো' আখ্যানে রাজার কন্যাপণ দেওয়ার কথা জানা যায়। ভাবী জামাইকে কনের বড় ভাই এবং বোনের বরণ করে নেওয়ার কথা জানতে পারি। সে সময় বিবাহের বিভিন্ন রীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। ছত্রকাকই দাসীকে 'পানিছিটা' পদ্ধতিতে বিয়ে করা, 'কাত্যায়নী পূজা' ব্রতে 'মিস্তর ধরা' অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে। বিয়েতে বিভিন্ন কুটুম্বের দান প্রদান ও বিয়েতে হাস্যকৌতুকের বিষয়গুলিও আখ্যানে বর্ণিত হয়েছে। সমাজে নারীর অবস্থা, বন্ধ্যা নারীর কষ্ট, নারীদের কেশ বিন্যাস, অলঙ্কার, পোশাক পরিচ্ছদ, রন্ধনপ্রণালী ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এই ব্রতকথা গানে সমকালীন ভাষা বৈশিষ্ট্য, শব্দচয়ন বাক্যগঠন, উপমা প্রয়োগ ও পুনরাবৃত্তির সুষমা প্রয়োগে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সাহিত্যের উপাদানগুলিকে খুঁজে পাওয়া যায়। সর্বোপরি এই ব্রতকথাগুলি আখ্যান বর্ণনে তৎকালীন সময়ের রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে বর্তমান সময়ের তুলনামূলক একটা চিত্রলিপিও অনায়াসে খুঁজে নেওয়া যায়। যা সমাজ ও সংস্কৃতির নিরিখে গুরুত্বপূর্ণ।

লোকসঙ্গীত তো লোকায়ত জীবনের দর্পণ। জীবনের গতিশীলতা ও সমকালের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। রাজবংশী সমাজ জীবনের ক্ষেত্রেরও তাই, রাজবংশী সমাজ জীবনে সঙ্গীত তো সূতিকা গৃহ থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত। পরতে পরতে গান সংস্কারের অঙ্গীভূত হয়েছে। রাজবংশী সমাজে লোকসঙ্গীতের ভাণ্ডারটিও সুবিশাল। ধর্মীয় সংস্কৃতির সঙ্গেও সম্পৃক্ত হয়েছে। দেহবাদী মনোজগৎ থেকে রঙ্গরসিকতা, জীবনমুখী গানের ছড়াছড়ি। আবার পরিবেশ প্রকৃতি আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটও গানের সুরে ধ্বনিত হয়েছে। সেখানে সমাজ সংস্কৃতির বাক্‌বদলের চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায়। শব্দ ব্যঞ্জনা, উপমা, প্রতীক ব্যবহার কিংবা ঘটনার বিন্যাসে সাহিত্যের উপাদান সংযোজিত হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। গ্রামের নিরক্ষর অতি সাধারণ মানুষের এই সৃজন ক্ষমতা ও ভাবনা সাহিত্যের মূল্য বিচার বিশ্লেষণে সাহিত্যের দিকটি উজ্জ্বল হয়। সেখানেও সমাজ জীবনের পরিবর্তনের আভাসগুলি ধরা পড়েছে চেতনা ও ভাববোধে। রাজবংশী লোকসঙ্গীতে আমরা এক লহমায় পেয়ে যাই ধর্মীয় জীবন, ধর্ম নিরপেক্ষ জীবন, আধ্যাত্মিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন সেইসঙ্গে জীবনচর্যার পর্যায় ভিত্তিক গান যেমন বিয়ে, পূজা-পার্বণ, মৃত্যুচেতনা, দেহতত্ত্ব, মনঃশিক্ষা বিষয়ক, প্রকৃতি প্রেম, জীবনরস, বোধভাবনার গান সাহিত্যের মূল্যে যা অমূল্য সম্পদ। আবার পেয়ে যাই সময়কালের পরিস্থিতি, সমাজ

জীবনের ছবি। বিভিন্ন মত ও ধারার সংযোজন ঘটেছে চেতনাবোধের উত্তরণে। আধুনিকতার বিচারেও ভাওয়াইয়ার কাব্যগীতি নিঃসন্দেহে যুগোপযোগী।[২৪] ভাষা হল সাহিত্যের প্রাণ আর সাহিত্য ভাষার পরিবেশন। ভাষার আগেই জন্মায় সুর, সুরের প্রভাবে ভাষা অবগাহন করেই জন্ম দেয় গানের। তাই গান সৃষ্টির উপর নির্ভর করে সাহিত্যের উৎকর্ষ। সাহিত্যের প্রাণ ভোমরা সংশ্লিষ্ট সমাজের গান। সেই বিচারে ভাওয়াইয়া গানও উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য।[২৫] ভাওয়াইয়া গানে রাজবংশী সমাজজীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে তাই প্রাগসরতা এবং সাংস্কৃতিক বিবর্তনের দলিল বটে।

ভাওয়াইয়া সঙ্গীতে বৈষ্ণব পদাবলীরই পদচারণা লক্ষ করার মত।

"আর যদি দ্যাকোং আর যদি শোনোং অইন্যজনের সঙ্গে কতা।
এ হেনা যৈবন সাগরে ভাসামো পাষাণে ভাঙ্গিমো মাতা।।

যেদিন দেখিব আপন নয়ানে, কহে কার মনে কথা।
কেশ ছিঁড়িব বেশ দূরে থোব, ভাঙ্গিবো আপন মাথা।।

নিচের গানের কথাগুলি তো তৎকালীন সমাজ জীবনের ছবিকে তুলে ধরে —

ওকি বাইদন
কি দেকিবা দিলারে বিয়া মোর
আমার শ্বশুর বাড়িত চালোত্ নাইরে ছন।
পিন্দনে নাই কাপড় বাইদন ঘরে নাই খাওন।

(বাইদন - বাপধন; ছোন - খড়; পিন্দন - পরিধান)

কিংবা

আই মুই সকীন দ্যাকিয়া বসনু রে কাইন/দিন মানেনা
পরে হাতের গাইন, দিনে আইতে বেড়াওঁ বারাবানি।

(সকীন - সৌখিন; কাইন - দ্বিতীয় বিবাহ; গাইন - উদুখলের পেষণ দণ্ড; বেড়াওঁ বারাবনি - ধান কুটে বেড়ানো)

ভাওয়াইয়া সঙ্গীতে প্রকৃতি পরিবেশ অনাবিলভাবে ধরা পড়েছে। নদী, পশু-পাখি কোনকিছুই বাদ যায়নি, জীবন সংলগ্নতাকে প্রকাশ করেছে।

"ও বিরিক্ষো শিমিলারে — গগনে ম্যালে ঠ্যাল্
নারী হয়্যা অসের যৈবন আইক্‌বো কতয়কাল।
বিরিক্ষো মোর শিমিলারে- -।।"

কিংবা

"দৈয়ল রে - - কার জইন্যে আকিবোরে সোনার যৈবন।
লাজে নাই কঙ দৈয়ল রে দৈয়ল বাপো মায়ের আগে।
তোলা মাটির কলা য্যামন হল্‌ফল্ হল্‌ফল্ করে
ঐ মত সোনার যৈবন দিনে দিনে বাড়ে রে।।"

নদীও এসেছে জীবনের সঙ্গে অন্বিত হয়ে।

ও নদীরে, ও মোর তিস্তারে —।
ও রে তোর য্যামন থৈ থৈ ব্যালা
সেইমত মোর হৃদের জ্বালা রে।

(ব্যালা - নদীর বুকে ওঠা ঢেউ)

উপমায় জীবন্ত হয়ে ওঠে হৃদয়ের গোপন ভাষা। এ তো সাহিত্যেরই অংশ। ভাওয়াইয়ায় এরকম ছত্র, কলি অসংখ্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। পশুও এসেছে গানের কথায় —

"পাটাবাড়ীত মোর শিয়াল কান্দে, কান্দে শিয়াল মোর অনুরাগে,
আজি কালা মুই একেলায় রে।"

কিংবা আব্বাস উদ্দিনের সেই বিখ্যাত গান —

"ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে।
ফান্দ বসাইছে ফান্দি রে ভাই পুঁটি মাচো/মাছো দিয়া।
(ওরে) মাছের নোভে/লোভে বোকা বগা পড়ে উড়াও/উড়াল দিয়া রে।।
ফান্দে পড়িয়া রে বগা করে টানাটুনা,
(ওরে) আহারে কুক্কুরার সূতা, হলু লোহার গুণা রে।

ফান্দে পড়িয়া রে বগা করে হায়রে হায়,
(ওরে) আহারে দারুণ বিধি সাথী/সাতী ছাউড়া যায় রে।।
উড়িয়া যায় চকোয়ারে পংখী বগীক্ বলে ঠারে,
(ওরে) তোমার বগা বন্দী/হইছে/হইচে ধল্লা নদীর পারেরে
এই কথা/কাথা শুনিয়া রে বগী/দুই পাখা/পাঙ্খা মেলিল,
(ওরে) ধল্লা নদীর পাড়ে যাইয়া দরশন দিল রে।
বগাক্ দেখিয়া বগী কান্দেরে
বগীক্ দেখিয়া বগা কান্দেরে।''

প্রতীকী ব্যবহারে যে মুন্সিয়ানার লক্ষণ তা তো সাহিত্যের উপাদান। 'বগার ফান্দে পড়ার' মধ্যে দিয়ে জীবন সংসারের জটিল আবর্তে আটকে পড়ার বিষয়টিকে অসম্ভব বোধ বীক্ষায় গ্রামের লোকশিল্পী রচনা করেছেন। আবার সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতিও সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করেছেন। সর্বোপরি দেহচেতনারও উর্দ্ধে উঠে মায়া কায়ার থেকে উত্তরণের বার্তাও নিহিতে দিয়ে রেখেছেন। আত্মা পরমাত্মার তত্ত্ব সম্পৃক্ত করেছেন অসম্ভব দক্ষতায়। এখানেই তো সাহিত্যের গুরুত্ব, ট্র্যাজেডিকে সম্পৃক্ত করেছেন। আলঙ্করিকের সন্ধানও আমরা পেয়ে যাই —

'হাঁটিয়া যাইতে নদীর জল
খাক্লুম কি খুক্লুম কি খল্লাল খল্লাল করে।'

কিংবা দীঘল নারীর বর্ণনায় অপূর্ব সংযোজন —

'হাটিয়া যাইতে কমর ঢোলে—
আহারে, কাঙ্কিনী গচের গুয়া।'

উপমা, ব্যঞ্জনা কিংবা প্রতীকীতে সমুজ্জ্বল। যা সাহিত্যেরই অনুষঙ্গও বটে। ভাওয়াইয়া গানের সাহিত্য সৌন্দর্য এভাবে ছত্রে ছত্রে ধরা পড়েছে।

পরবর্তীকালে সমাজ অর্থনীতির পরিবর্তনের সাথে সাথে লোককবিদের মনন দর্শনেরও পরিবর্তন ঘটেছে। বিভিন্ন বিষয় প্রসঙ্গ উঠে এসেছে, ধরা পড়েছে সমকালীন সময়ের চিহ্ন কিংবা অবস্থান। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ে রাজবংশী গ্রাম সমাজ ছিল সহজ, সরল, মানবিক আত্মীয়তার পরিসরে আবদ্ধ। সেখানে সঙ্গীতও রচিত হয়েছে প্রকৃতি পরিবেশের অনাবিল

মুক্তাঙ্গনে, গভীর জীবন সাযুজ্যে। মনের উদাত্ত ভাবনা, চিন্তা চেতনায় প্রকৃতির উপসর্গগুলি জীবন সাযুজ্য হয়েছে একান্ত অনুভবে। পরবর্তীকালে ভূগোল, ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি বদলের সাথে সাথে সঙ্গীতের বর্ণনা, কথা, ভাষ্য, প্রতীক, উপমাও পাল্টে যায় যা সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকে সূচিত করে। ধর্মীয় গীতি সঙ্গীতগুলি অপসৃয়মান হয়, জীবনমুখী, সমাজমুখী ভাবনার প্রতিফলন বেশি করে ঘটে। তাই তো দেহতত্ত্ব-মনঃশিক্ষার গানগুলি কিংবা চারযুগের গান এবং জীবনরসের গানগুলি হারাতে বসেছে। রাজবংশী সমাজজীবন, আর্থসামাজিক কাঠামো পরিবর্তন ঘটার সাথে সাথে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সূত্র ধরে এই পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

কথায় কথায় প্রবাদ -প্রবচন বলার লোক যেমন কমে যায় তেমনি সঙ্গীত রচয়িতার ক্ষেত্রে বর্তমান সময় পরিস্থিতির বিষয়গুলি চলে আসে। ইতিমধ্যে পালাগান, লোকনাটকের অপসৃয়মানতা ভিন্ন এক শূন্যতার সৃষ্টি করে। ভাষা-শব্দ, ভঙ্গি, পোষাক-পরিচ্ছদ পাল্টে যায়। ইতিমধ্যে পূজার্চ্চনা, ব্রতপালন তৎসংক্রান্ত গান বাজনা (যেমন হুদুম দ্যাও, কাতি পূজা, সোনা রায়ের মাগন, গমীরার গান ইত্যাদি) কমে যায়। বর্ণহিন্দুদের কিছু আচার-সংস্কার পূজা-পার্বণ রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়। স্বভাবতই এক ভিন্ন সাংস্কৃতিক আবহ তৈরি হয় যে আবহ রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির আবাহন কালের অনেক কিছুরই বিকৃত রূপ হয়ে ওঠে। সেটা নাচ গান থেকে সংস্কার, রীতি আচার এমনকী মনন ভাবনাতেও। এই পরিবর্তন স্বাধীনোত্তর কয়েক দশকে ভিন্ন এক সাংস্কৃতিক সংকটের জন্ম দেয়। তা সত্ত্বেও বলা যায় রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির আদি কৌম চিহ্নগুলি একেবারে হারিয়ে যায় নি। এর মধ্যে কৃষ্টি সংস্কৃতি নিয়ে একটা অংশ সচেতন হয়েছে। ভাষা সংস্কৃতি নিয়েও একটা উদ্যোগ লক্ষ করার মত। এই সাংস্কৃতিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতি আবর্তিত হয়ে যাচ্ছে।

ভাওয়াইয়া সঙ্গীত কীভাবে সময়কালীন সমাজভাবনা ও সমাজ আবহকে প্রতিফলিত করে সেটা দেখতে পাই আব্বাসউদ্দিনের ব্রিটিশ বিরোধী গানের মধ্যে—

‘ও ভাই মোর গাঁওয়ালিয়া রে
চতুর্দিকে জ্বলে সূরুয বাতি,
তোমরা ক্যানে আঁধার রাতি রে।।
হায়রে হায়, পরের বোঝা তোমরা কদ্দিন বইবেন ভাই

ভাই মোর গাওয়ালিয়ারে রে।।
বালুটিটি পংখী কাঁদে নিজের আহার খুঁজির বাদে রে
হায়রে হায়, তোমরা বুজি নেও নিজের অধিকার
ভাই মোর গাওয়ালিয়ারে রে।।

এক বেলা তোমার অন্ন জোটে, পেন্দোনোত তোমার কাপড় কোন্‌টে
হায়রে হায়, তোমরা বুঝি নেও নিজের অধিকার
ভাই মোর গাওয়ালিয়ারে রে।।

তোমার হাতোত ভাইরে কোদাল কাঁচি
তবু প্যাটে পাথর বাঁধি আছেন বাঁচি রে, আর তোমরায় জোগান ভাত
ভাই মোর গাওয়ালিয়ারে রে।'

রাজবংশী সমাজের ভাওয়াইয়া সঙ্গীতে সুদূর অতীতকাল থেকেই সমাজ, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, রীতি আচারের প্রতিফলন ঘটেছে। আজকের সময়েও সেই একই ধারা পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক বিষয়ের সঙ্গে প্রাচীন সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি নিয়েও গান রচিত হচ্ছে। ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের কথা ও সুরে প্রচলিত কথাটি ভীষণভাবে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ রচয়িতার নাম উহ্য হয়ে শিল্পীর মুখে মুখে তা ছড়িয়ে পড়ে। আধুনিক সময়ের গানেও রচয়িতার নাম বিশেষ শোনা যায় না। এরকম একটি গান, যে গানের মধ্যে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির পরিচয় যেমন পাওয়া যায় তেমনি অতীত ঐতিহ্য নিয়ে গোষ্ঠী পরিচয়কে তুলে ধরেছে।

আমরা রাজবংশী ভাই — আমরা রাজবংশী ভাই
এই মাটিরে ছাওয়া আমরা ভাওয়াইয়া গান গাই
রে ভাই ভাওয়াইয়া গান গাই, হে।
আসাম, বাংলা, জলপাইগুড়ি যেমন সোদর ভাই
আমরা পরসী নোয়াই এই মাটিরে
ছাওয়া আমরা ভাওয়াইয়া গান গাই।

আছে রে ভাই রাজবাড়ী — সিংহ দুয়ার আছে পরি (২)
বড় দেবী সাগর দীঘি আরো কত ভাই
নাই রে নাই ভাই মইশের বাথান
আছে খালি ভাওয়াইয়া গান — এই ভাওয়াইয়া
গান যে আমরা মিলিমিশি গাই আর এই মাটিরে
ছাওয়া আমরা ভাওয়াইয়া গান গাই।।

ছ্যাকা প্যালকা সিদল আওটা — শুকান চুরা মাছের ভরতা (২)
দই চুরা আর শাক সুকাতি বারো মাসে খাই
ধাপরা পুয়া পুষনার দিন — ছুবিয়া খাই আরো
বাঁশের ঢিং — জাকই পলো নিয়া আমরা
বাহো মারির যাই আর এই মাটিরে
ছাওয়া আমরা ভাওয়াইয়া গান গাই।।

চেমুক খেলা দাড়িয়া বান্দা — আটখরি আর যোল পাইতা (২)
হাডুডু আর বউছি লাঠি আমরা প্রিয় খেলা ভাই
মদনকাম আর বিষহরি সতপির মাশান বুরাবুড়ি
গোরখনাথ আর সোনারায়ের পূজা করি ভাই
আর এই মাটিরে ছাওয়া আমরা ভাওয়াইয়া গান গাই।।

● বাংলা সাহিত্যে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি

উত্তরবঙ্গের বৃহত্তম জনজাতি এই রাজবংশী জনগোষ্ঠী। কয়েক শতাব্দী ধরে এই রাজবংশী সংগঠিত ও সুদৃঢ় হয়েছে। এই রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনেক জনজাতি গোষ্ঠীর মহাসম্মীলন ঘটেছে সময়কালের ঘাত প্রতিঘাতে। এক দীর্ঘ পথ পরিক্রমা, আত্তীকরণ, সংশ্লেষণ, সংমিশ্রণ, আরোপনের মধ্য দিয়ে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতি আজকের সময়ে এসে পৌঁছেছে। উত্তরবঙ্গের এই ভূখণ্ডটি বাংলা সাহিত্যের অনেক আখ্যান কাহিনির কেন্দ্রবিন্দু হয়েছে। বিস্তার লাভ করেছে এতদঞ্চলের অধিবাসী, সমাজজীবন, সংস্কৃতি, মননবীক্ষার আলোকপাতে। স্বাভাবিকভাবে রাজবংশী সমাজ জীবন, ধর্ম সংস্কৃতির বিষয়গুলি ধরা পড়েছে। আবার আখ্যান কাহিনির কলমে গাথা হয়েছে তৎকালীন সময়ের সমাজ, পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক অবস্থান ও বিবর্তনের ছবিও। সেটাই আমরা বাংলা সাহিত্যের বেশ কয়েকজন প্রথিতযশা সাহিত্যিকের লেখনীতে পেয়ে যাই। বিষয় সময় প্রেক্ষাপটের নিরিখে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের কলমেও উত্তরবঙ্গের বিশেষ করে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি ধরা পড়েছে। গল্প কবিতায়ও রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি গুরুত্ব পেয়েছে। সাহিত্যিক দেবেশ রায়ের 'তিস্তা পারের বৃত্তান্ত' তো রাজবংশী সমাজ জীবনকে ঘিরেই। তাঁর 'তিস্তাপুরাণ', 'মফঃস্বলি বৃত্তান্ত'-এ রাজবংশী সমাজ জীবনের ছবি আমরা পেয়ে যাই। অমিয়ভূষণ মজুমদারের আখ্যান, উপাখ্যানের পরিসর তো প্রান্তবর্তী কোচবিহার সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ও রাজবংশী সমাজ জীবনের আলোকেই উদ্ভাসিত হয়েছে। তাঁর 'মহিষকুড়ার উপকথা', 'দুখিয়ার কুঠি' কিংবা 'নয়নতারা'য় সমাজ ও সময়ের চিহ্ন প্রতিভাত হয়েছে। স্মৃতিসত্তায় অতীত বর্তমান উঠে এসেছে নিবিড় অনুভব ও দৃষ্টিভঙ্গিতে। সেখানে গভীর আত্মীয়তাও প্রসারিত হয়েছে। আজীবন তিনি আসংলগ্ন ছিলেন 'গড় শ্রীখণ্ডের' রাজনগর ও ভুবনজোতের জীবন ও সমাজে। সামগ্রিকভাবে উত্তরবঙ্গ অনেক সাহিত্যিকের সৃজন আখ্যানে স্থান পেয়েছে কিন্তু দেবেশ রায়, অমিয়ভূষণ মজুমদার উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক ও সামাজিক অবস্থানকে প্রাধান্য দিয়ে রাজবংশী সমাজ জীবনকে ভিন্ন মাত্রায় বৃহত্তর পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরেছেন। পরবর্তীকালে আরও কয়েকজন ঔপন্যাসিক, গল্পকার রাজবংশী সমাজজীবনকে আলোকপাত করেছেন নিজস্ব আখ্যান বিশ্বে। বিপুল দাস, চোমংলামা, দেবাশীষ চক্রবর্তী, জীবন সরকার, পীযূষ ভট্টাচার্য সহ আরো

অনেকে। অভিজিৎ সেনের নাম গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। তাঁর গল্প 'দেবাংশী' নাট্যরূপে বিপুল জনপ্রিয় হয়েছে। তুলসী লাহিড়ীর নামও করতে হয় তাঁর 'ছেঁড়াতার' নাটকের জন্য। উৎপল দত্ত নকশাল আন্দোলনকে প্রেক্ষাপট করে রাজবংশী সমাজজীবনকে ভিন্নভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর 'তীর' নাটকে। নাট্য সাহিত্যকেও আমরা বাদ দিতে পারি না। হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের নাটকে যেমন ধরা পড়েছে তেমনি রাজবংশী সমাজ জীবনের অবস্থান উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নাট্যকারের কথায় রাজবংশী সমাজজীবন ও সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়গুলি আধারিত হয়েছে। সাহিত্যে রাজবংশী সমাজজীবনের অধ্যায়টি কোনভাবে ব্রাত্য থাকেনি। ধারাবাহিকভাবে উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপটে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি বিভিন্ন আঙ্গিকে বিষয় হয়ে উঠেছে।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের সর্বেক্ষণ মাটির কাছাকাছি থেকে, অনুভূতি ও অনুভবের স্তর থেকে বিষয়ভাবনাকে তিনি তাঁর আখ্যান, গল্পে ঠাঁই দিয়েছেন। গতানুগতিক ধারা, ধরনের পথে তিনি হাঁটেননি। মননের স্তরেই তাঁর ব্যাখ্যান, অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে। এভাবেই হয়ে উঠেছে তাঁর উপন্যাস ও গল্পের বিষয় পরিসর। সমস্ত প্রতিবেশ, জীব-জড় জগত আবদ্ধ হয়েছে কথনের সম্প্রসারণে। সেখানে জীবন এসেছে, কথা বলেছে, নড়াচড়া করেছে, সম্প্রসারিত হয়েছে দেখা ও অনুভবের শব্দমালার গাঁথুনিতে। চরিত্রের বিকাশও ঘটেছে মনন জগতের পর্যবেক্ষণে। ভিন্ন এক আন্তরিক যোগাযোগের সেতু রচনা করেছে তাঁর লেখনি। এরকমই একটি উপন্যাস 'মহিষকুড়ার উপকথা' ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশ পায়। গল্পের পটভূমি তারও বহু আগে রাজন্যশাসিত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এলাকার প্রান্তজীবনের পারিপার্শ্বিক কথা, পরিবর্তনের ঢেউকে আশ্রয় করে।

চারিদিকে ঘন অরণ্য, বন্য জন্তুদের নিরন্তর আনাগোনা, হাঁটা পথ, গরুর গাড়ি, থমথমে গুরুগম্ভীর পরিবেশে কতিপয় মানুষের পরিবার, সমাজ। আদি জনগোষ্ঠীর আদিম সংস্কৃতির ছোঁয়া, বিশ্বাস, সংস্কার, জীবন-জীবিকা, সহজ সরল ধর্ম মানবিকতা তারই মাঝে চালাক, ধুরন্ধর, লোভী জাফরুল্লা সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রতীক। নিঃসর্গ প্রকৃতি, অরণ্যচারী সমাজ সভ্যতাকে ভিত্তি করেই মানুষ চরিত্রগুলোকে চিত্রিত করেছেন। আসকাফ জাফরুল্লার চাকর — আদিম সমাজ সংস্কৃতির হাতিয়ার হয়ে বর্তমান কৃষিসভ্যতার পথিক হয়ে উঠেছে। অরণ্যের সেই প্রকৃতি সমাজ সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড়তার মাঝে মানবসভ্যতার আগ্রাসী মনোভাব, বন উচ্ছেদ, দখলদারী,

জমিদারির ক্ষমতা বিস্তার; মানুষকে পশুর মত দাসত্বে বাধ্য করার মানসিকতার উচ্ছ্বাস, সব মিলিয়ে ভিন্ন এক প্রতিবেশ রচনা করে প্রেক্ষাপটের বিস্তারে। হারানো জল জঙ্গল, বুনো জন্তু, মোষ, বাইসন, অতীত সময় কথা বলে ওঠে। অরণ্য ধ্বংস, কালো পিচের রাস্তা ধরে প্রকৃতি সভ্যতাকে গ্রাস, আধিপত্য কায়েম ইত্যাদির আড়ালে শোষণ শাসনের ব্যাপ্তি প্রতিভাত হয়েছে। ঘটনার বিন্যাসে চরিত্রগুলি এই পরিবর্তনের ক্রিয়নক হিসাবে বিচরণ করেছে সময় সভ্যতার শরিক হয়ে। আসকাফ, কমরুদ্দিন, মুন্নাফ চরিত্রগুলি বনের কোলে এক শৃঙ্খলার মধ্য থেকে পরিবর্তনকে অনুভবে দেখে নেয়। আসলে এই পরিবর্তন শুধু বাইরের নয় ভেতরের। জাফরুল তার শরিক। ভোগের লিপ্সায় অরণ্য নিষ্কাশিত হয়ে সমাজ সংস্কৃতির পরিবর্তন 'মহিষকুড়ার উপকথা'র মূল আবেদন। বন্য মোষের মত, বাইসনের মত প্রকৃতির শৃঙ্খলকে বশে আনার লড়াই। সেখানে জাফরুল্লার লড়াই জোর করে জমি দখল, সেটেলমেন্টের লোকজনকে নিয়ন্ত্রণে আনা, বেআইনি কাজ করা সবই তথাকথিত সভ্যতার আড়ালে বেড়ে উঠেছিল। আসকাফের চোখে ধরা পড়েছে বুনো মোষের পোষ মানার মত বিষয়। মহিষকুড়ার উপকথা একাধিক খণ্ডাংশের গল্প। সেখানে অনুভূতি উপলব্ধিই প্রাধান্য পেয়েছে। ইতিহাস রূপকথা-উপকথা মিলেমিশে সময়, স্থিতিকে অবলোকন করেছে ছোট ছোট চরিত্রের মধ্য দিয়ে। এই প্রান্তীয় অংশের সমাজজীবন যেভাবে অরণ্য ঘেষা নিরালম্ব স্থিতিতে চলমান ছিল তা হঠাৎই ধীরে ধীরে বদলাতে শুরু করে সভ্যতার গুটিকয় মানুষের পিপাসায়। ইতিহাস ভূগোল বদলে যায়। এই সরল জনপদের অধিবাসীদের সমাজজীবনের রূপান্তরের কথকতা আমাদের ভাবায়। 'ডারিঘর' যেমন আগুনের মালসা ঘর হয়, আসকাফের তাই বিভ্রান্তি হয় 'ভুলুয়া ধরলে কালে জ্বর হয়', 'ভুলুয়া ধরা', 'পরী ধরা' বিষয়গুলি তাই নিছক বিষয় নয়। বৃত্তান্তের ভেতর নড়াচড়া করে। যেমন করে বাথান গড়ে ওঠে, বুড়ি মোষের মৃত্যু হয়। চরিত্রে (জাফরুল্লা, আসকাফ, মুন্নাফ) এতদঞ্চলে নস্য শেখ মুসলিম সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে উঠে এলেও আদপে এই অঞ্চলের আদি জনগোষ্ঠী রাজবংশী সমাজও এর বাইরে নয়। দীর্ঘ এক পরিবর্তনের সাক্ষী। চোখের সামনে এই ঘন পরিবর্তন অনুভবের জগতে নাড়া দেয়। 'মহিষকুড়ার উপকথা' এক দীর্ঘ সময়ের পরিবর্তনের বৃত্তান্ত। ছোট ছোট ঘটনায় (পিচের রাস্তা, বাথান, রিজার্ভ ফরেস্ট ঘোষণা, জাফরুলের লরি কেনা, শহরে ওষুধ আনতে যাওয়া ইত্যাদি) সবই একপ্রকার বিস্তার। রাজবংশী সমাজও

এই পরিবর্তন, সময়ের শরিক। ভূমিজ কৃষি সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সমাজ সংস্কৃতির যে পরিবর্তন সেটাকেও অন্তরালে সূচিত করেছে। মীরজুমলার আগমন দিয়ে যে সময়কালের সূত্রবিন্দু ধরা হয়েছে পরবর্তীকালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আইনকানুন, বিভিন্ন উপায়ে জাফরুলের মতো জমিদারের উদ্ভব সবই রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির বাইরে নয়। এই ছবি তো শুধু প্রান্তীয় কোচবিহারের একটি অংশের নয় সামগ্রিকভাবে রাজবংশী সহ অন্যান্য সমস্ত জনগোষ্ঠীর চোখের সামনে ভূগোল-ইতিহাস পাল্টানোর উপকথা। সেখানে সংস্কৃতির বিষয়টি তো ওতপ্রোতভাবে আসে। ‘মহিষকুড়ার উপকথা’ তাই এতদঞ্চলের সামগ্রিক পরিবর্তনের আখ্যান। আবাহন কালের সমাজ ও সংস্কৃতির দিক চিহ্নিত বিস্তার।

‘নয়নতারা’ উপন্যাসে তিনি উনিশ শতকের পরিবর্তমান সমাজ ও সময়কে চিহ্নিত করেছেন। ‘মহিষকুড়ার উপকথা’তেও তিনি এতদঞ্চলের কয়েকশ বছরের পরিবর্তনকে ধরতে চেয়েছেন। সেখানে শুধু ভূগোল-ইতিহাস ছিল না, ছিল সমাজ সংস্কৃতি, মনন ভাবনা সেইসঙ্গে আপোষ ও সমঝোতার মানসিক পরিবর্তন যেমনি করে বুনো মোষ ‘ফান্দি’র দ্বারা বাথানের মোষ হয়ে পোষ মানে, তেমনি। সমকালীন নানা সংস্কার, চেতনা, অভিপ্রায়, দ্বিধাদ্বন্দ্ব, লড়াই, সমঝোতা, জাফরুলের মত লোকের উত্থান সবই সময়কালের নিরিখে সমাজ ও ইতিহাসের কথকতা ও অতিক্রমণ বৃত্তান্ত।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের আরেকটি অসামান্য উপন্যাস ‘দুখিয়ার কুঠি’ (১৩৬৪ বঙ্গাব্দ)। যে উপন্যাসে উত্তরবঙ্গের আদি কৌম জনগোষ্ঠীর সমাজ সংস্কৃতি পরিবর্তনের সময় সন্ধিক্ষণ সূচিত হয়েছে সড়ক যোগাযোগের বিস্তার ভূমিতে। এই সড়ক যোগাযোগকে ঘিরেই উত্তরের এক প্রান্তীয় খণ্ডে সমাজজীবন আধুনিকতার অনুসন্ধান খোঁজে। লোকায়ত সংস্কৃতি ইতিহাস প্রমুখ হয়ে ওঠে ঘটনার বিন্যাসে। আরণ্যক প্রকৃতি নিবিষ্ট কৌম সমাজ প্রাথমিক স্তরে সভ্যতার যোগাযোগকে মেনে নিতে পারে না। বিস্ময়, কৌতূহল, আকর্ষণকে পাথেয় করে ধীরে হলেও আধুনিকতার পরশ নিতে শুরু করে কৌম জনগোষ্ঠী। তাদের জীবনধারা পাল্টে যায়, জীবিকা পাল্টে যায়, অনেকে শহরমুখী হয়, অনেকের মধ্যে আধুনিক হওয়ার আগ্রহ তৈরি হয়, সচেতনতা বৃদ্ধি পায়, দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে যায়। অনেকে সর্বস্বান্ত হয়ে রাগ, ক্ষোভ, দুঃখ নিয়ে জীবনজীবিকার স্বার্থে অন্যের দাসত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়। মাতালু, কাঁকরুর মত চরিত্রগুলি এই দ্বিধা দ্বন্দ্বের

ভাবনা নিয়েই বিষয়ের প্রতিনিধিত্ব করেছে। এই নতুন আধুনিকতা যে এক নতুন সংকটের জন্ম দেয় সেটা ঘটনার বিন্যাসে ধরা হয়। একটা পরিবর্তন — সমাজের পরিবর্তন — সর্বোপরি সাংস্কৃতিক পরিবর্তন। সময়কাল ক্ষণটিকে ঘটনার বিন্যাসে আনুমানিক চিহ্নিত করা যায়। বিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্নের পাশাপাশি সময়কে ধরলে বোঝা যায় আরণ্যক প্রকৃতি ঘেষা সমাজজীবনে কীভাবে আধুনিকতার ঢেউ ছুঁয়ে যায়। মানুষের আগমন বেড়ে যায়। যাতায়াত সুগম হয়। গ্রাম গঞ্জে মানুষের বনভূমির সংকোচন ঘটে। পোশাক আশাক পাল্টে যায়। বিলাতি কাপড় চোপড় আসতে থাকে। এন্ডির চাদর, হাতে বোনা কাপড়ের কদর কমে যায়। হাট বাজার, দোকানপাটের চেহারা বদলে যায়। গ্রামের শান্ত স্নিগ্ধ জীবন গতিময়, চঞ্চল হয়ে ওঠে। মাতালুর মত কিছু মানুষের আধুনিকতার প্রতি ঝোঁক তৈরি হয়। আধুনিকতা শহুরে সভ্যতার নানাবিধ উপসর্গ গ্রাম্যজীবনেও অন্তর্ভুক্ত হয়। ঠক লোকের সংখ্যা বাড়ে। মাফিয়ার জন্ম হয়। ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব বাড়ে। ভাইয়ে-ভাইয়ে মামলা মোকদ্দমা, অর্থ উপার্জনের জন্য লখাই চক্রবর্তীর মত চোরাকারবারীর আগমন ঘটে। সব মিলিয়ে সম্পর্কের মধ্যে জটিলতর বিন্যাস রচিত হয়। ভয়, অবিশ্বাস, ক্রোধ, ক্ষোভ অনেক কিছুর জন্ম দেয়। দুখিয়ার কুঠি উপন্যাসে গদাধর নদী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার নিস্তরঙ্গ জীবনে কৌম আদিবাসী জনগোষ্ঠীর লোকায়ত ভুবনের কথাই বিন্যস্ত হয়েছে। এই উপন্যাসের ঘটনাক্রমে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বিশেষ করে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, সর্বোপরি সাংস্কৃতিক পট পরিবর্তনের ছবিই ধরা পড়ে। মূলত ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, ব্রিটিশ উপনিবেশিক ক্ষমতা বিস্তার, ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন কিছু মানুষ ও সরকারি কর্মচারীর যোগসাজসে নতুন শ্রেণির উদ্ভব, অভিবাসী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি সব মিলিয়ে গ্রাম সমাজ পাল্টানোর সাথে সাথে এতদঞ্চলের রাজবংশী সমাজ গভীর সংকটে আবর্তিত হয়। প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ত্বরান্বিত হয়। রাজবংশী জনগোষ্ঠী এক সন্ধিক্ষণের মুখোমুখি হয়। জীবনজীবিকা থেকে পরিবেশ, সামাজিক ব্যবস্থা, মনন বোধ ভাবনা সবেতেই এক দ্বিধা দ্বন্দ্বের সূচনা ঘটে তাই যথাযথভাবে 'দুখিয়ার কুঠি' উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। এই উপন্যাসে ঘটনা বিষয়ক্রম থেকে আমরা সুন্দরভাবে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর এক সাংস্কৃতিক বিবর্তনের সূচনা ও পরিক্রমণের বৃত্তান্ত পেয়ে যাই।

আরেক শক্তিশালী ঔপন্যাসিক দেবেশ রায়ের কয়েকটি উপন্যাসে (মফঃস্বলি বৃত্তান্ত, তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, তিস্তাপুরাণ) রাজবংশী সমাজজীবন ও সংস্কৃতির উপাদান ধরা পড়েছে। সাহিত্যিক দেবেশ রায় দীর্ঘদিন উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায় থেকেছেন। স্বাভাবিকভাবে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ছিল। তারই প্রতিফলন ঘটেছে এই উপন্যাসগুলির পটভূমিকায়। এই তিনটি উপন্যাসেই প্রতিফলিত হয়েছে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায় বসবাসকারী রাজবংশীদের সমাজজীবন। জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যেই উপন্যাস তিনটির ঘটনাবিন্যাস ঘোরাফেরা করেছে। উপন্যাসগুলিতে অন্যান্য জনগোষ্ঠীদের কথাও এসেছে তবে মূলত রাজবংশী সমাজজীবনের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। 'মফঃস্বলি বৃত্তান্ত', 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' দুইটি উপন্যাসেই জোতদারদের কথা এসেছে, আধিয়ারদের সঙ্গে সম্পর্কের কথা এসেছে, ভূমি সংস্কার আইনে জমি খাস হওয়ার বিষয়টি এসেছে। 'তিস্তাপারের বৃত্তান্তে' আছে জোতদারদের নিঃস্বত্ব ভূমিদাসের (চাকিন্দার) বাঘারুর কথা। তিস্তাপুরাণে আছে একটি জোতদার পরিবারের চাষবাস ও প্রাত্যহিক দিনলিপির ভাষ্য। 'তিস্তাপুরাণ'-এ রাজবংশী সমাজজীবন সংস্কৃতির বিস্তৃত বিবরণ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বাড়িঘর নির্মাণের বাস্তুতন্ত্রের শ্লোকটি উল্লেখ করে "পুবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ/উত্তরে গুয়া, দক্ষিণে ধুয়া।" আগদোর অর্থাৎ বাইরের 'এগিনা'য় ডারিঘর (বৈঠকখানা) ও ঠাকুরবাড়ি থাকার বিষয়টি তুলেছেন। 'ডারিঘরে'র বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। যদি তৎকালীন সময়ের জোতদার আধিয়ার সম্পর্কের আভাস সেভাবে স্পষ্ট হয়নি। শুধু 'তিস্তাপারের বৃত্তান্তে' গয়ানাথ জোতদারের সঙ্গে তাঁর চাকিন্দার বাঘারুর পার্থক্যটাকে স্পষ্ট করেছেন। জোতদারি ব্যবস্থার অনেক কিছু তাঁর উপন্যাসে ধরা পড়লেও পারস্পরিক সম্পর্কের যথাযথ ছবিটা ধরা পড়েনি। 'তিস্তাপুরাণে' একাধিক জোতদারের প্রসঙ্গ এসেছে। বুড়িমার গোতের প্রসঙ্গ ধরেছেন, আধিয়ারের প্রকারভেদের কথা তুলেছেন। অনেকে জোতদার হয়েও অন্য জোতদারের আধিয়ারী করতেন। ফরেস্টের জমি নিয়ে চাষ করার বিষয়টি উত্থাপন করেছেন। আবার অ-কৃষক জোতদারদের উদ্ভব নিয়েও কথা বলেছেন যাদের সঙ্গে আধিয়ারদেরও সরাসরি যোগাযোগ ঘটত না। তবে কোন উপন্যাসেই তিনি জোতদারকে অত্যাচারী শোষক হিসাবে প্রতিপন্ন করেননি। বরং পারস্পরিক যোগাযোগ, বিপদে আপদে পাশাপাশি থাকার বিষয়টি আলোকপাত করেছেন। আকাল বা সংকটে আধিয়ারদের

জোতদার সাহায্য করতেন এই আভাসই দিয়েছেন। সেই সময়কার জোতদার-আধিয়ার সম্পর্কে খারাপ ধারণা হয় না। বঙ্গদেশের অন্যান্য জায়গায় জোতদার জমিদারদের অত্যাচারের যে ঘটনার কথা শোনা যায় উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িতে অন্য ছবিই পাওয়া যায়। গরিব কৃষকদের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন। "শিষ দেখিলে বিশ দিন, কাটে মারে দশ দিন" প্রবাদে বর্ণিত হয়েছে। সামগাইনে চাল তৈরির বিষয়টি তিনি উল্লেখ করেছেন। 'হাউলি' খাটার কথাও তিনি তিস্তাপুরাণে উল্লেখ করেছেন। তার তিস্তাপুরাণ উপন্যাসে বিভিন্ন পেশার কথা জানতে পারি কলা বেচা, পান বেচা, কাপড়িয়া তেমনি ঘাটোয়ালদের কথাও উল্লেখ করেছেন। গাছে ওঠার মানুষ, গুয়া মানষি — যিনি সুপারি পেড়ে দেন, গীদালদের কথা বলতে ভোলেননি। আবার চাকিন্দার, রাখোয়াল, গাড়িয়াল বন্ধু, মাহুত, মৈষালদের কথাও বলেছেন। কষ্টের বৃত্তি ও জীবনের সুখ দুঃখের বিবৃতি দিতে গিয়ে তিনি ভাওয়াইয়া গানের প্রসঙ্গ টেনেছেন। এছাড়াও খাবারদাবার, পোশাক (ফোতা), ছ্যাকাপাড়া, ছ্যাকা-প্যালকা, খোকরা ভাত (বাসি ভাত) খাওয়া খাদ্যাভ্যাসের বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন। নামকরণে সময়কাল ধরে রাখার নীতির কথাও তুলে ধরেছেন। আবার তিস্তাবুড়ি পূজার গানে পছোরা চাদরের প্রসঙ্গ টেনেছেন।

সামগ্রিকভাবে বলা যায় দেবেশ রায়ের এই তিনটি উপন্যাসে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ের রাজবংশী সমাজজীবনের ছবি পাওয়া যায়। রাজবংশী সমাজের বাসস্থান, পেশা, খাদ্যাভ্যাস, পোষাক সহ আরও কিছু রীতিনীতি তিনি বিস্তার ধরেছেন। এটা বলা যায় স্বাধীনতা পূর্বকালের কয়েক দশকের আর্থ-সামাজিক কাঠামো সহ রাজবংশী সমাজজীবনের বিস্তৃত ছবি তিনি আখ্যানে তুলে ধরেছেন। সেইসঙ্গে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির পরিবর্তনের সূচনা সময়কালকেও আধারিত করেছেন। কারণ তখন অভিবাসনের চাপ ততটা বোঝা হিসাবে চাপেনি উত্তরবঙ্গের জনজীবনে। একটা স্থিমিত নিস্তরঙ্গ শান্ত জীবনযাপনে উত্তরবঙ্গের মানুষ বিশেষ করে রাজবংশী সমাজের সমাজ ও সংস্কৃতি স্থিতাবস্থায় ছিল। কারণ তার পরেই বিশেষ করে স্বাধীনতার পরের দশকে জনবিন্যাসের চেহারা পাল্টানোর সাথে সাথে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতি বিবর্তমান হয়ে পড়ে। ক্ষোভ-বিক্ষোভও দানা বাঁধতে থাকে। পরবর্তী সময়কালটা আমাদের জানা — ভূমি সংস্কার, অপারেশন বর্গা, তেভাগা আন্দোলন নানাবিধ বিষয় রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির বুকে ঢেউ তোলে। দেবেশ রায়ের উপন্যাসে আমরা রাজবংশী সমাজজীবনের বিশ শতকের প্রথম ভাগের

ছবি যেমন পাই তেমনি পরবর্তী কয়েক দশকে আর্থসামাজিক কাঠামো ছবি বদলানোর সাথে সাথে সমাজ, সংস্কৃতি পরিবর্তনের বিষয়টিকে অনুধাবন করতে পারি। অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাসে যেমন অরণ্য ধ্বংস, কৃষিজমির সম্প্রসারণ, সেটেলমেন্ট ব্যবস্থা, সরকারি আইন বিধিব্যবস্থা, যোগাযোগের রাস্তাঘাট নির্মাণ, আধুনিকতার পরশ তার ঘাত-প্রতিঘাত, জনগণের বিভ্রান্তি, সমাজ সংস্কৃতির পরিবর্তন, সেইসঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক ব্যক্তিবর্গের আগ্রাসন ইত্যাদি বিষয়গুলি জানতে পারি এবং সেটা সময়কালের নিরীক্ষণে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর আর্থসামাজিক অবস্থান। ফলত দুই ঔপন্যাসিকের আখ্যানে আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না যে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি বিভিন্ন ঘাত -প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে আজকের সময়ে এসে পৌঁছেছে এবং সেটা গ্রহণ বর্জন, আত্তীকরণ, সংরক্ষণ ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে।

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস ‘বর্ষাদুয়ার’ সম্পূর্ণভাবে রাজবংশী সমাজের লোকদেবতা ‘মাশান’কে ঘিরেই আবর্তিত। মাশানকে ঘিরে ভয় বিশ্বাস, সংস্কার প্রতিপাদ্য হয়ে উঠেছে। মাশানের যাবতীয় প্রকারভেদ, চরিত্র, রাজবংশী সমাজজীবনে তার প্রভাব এই উপন্যাস থেকে জানতে পারি। সেইসঙ্গে তৎকালীন সময়কালে ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, কুসংস্কার, অন্ধত্ব, অসহায়তার কথা উঠে আসে। দেউসী, ভৌরিয়াদের আধিপত্য, তাদের ধান্দাবাজির বিষয়গুলিও উঠে আসে। উত্তরের চা-বাগানকে ঘিরে গড়ে ওঠা ঔপনিবেশিক জীবন, পরিবর্তমান সময়কালকে ঔপন্যাসিক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। লোক উপাদানের বুনোনে রাজবংশী সমাজে প্রচলিত প্রবাদ, গানকেও সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছেন। যেমন রেলগাড়ির চলা দেখে পটেশ্বরীর উচ্চারণ —

ইঙ্গিরাজের বুদ্দি ভারি
আনিছে এল গাড়ির কল।
এক দিক দি অঠিছে ধয়া
এক দিক দি পড়েছে জল।

আবার বর্ষায় জল জঙ্গলের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে পশুপাখির সঙ্গে মাহুত আন্ধারুর গলায় গান শোনায় —

'আরে তোমরা গেইলে কি আসিবেন, মোর মাহুত বন্ধুরে
হস্তী রে নড়ান, হস্তী রে চড়ান, হস্তীর গলায় দড়ি
ওরে সত্য করিয়া কন রে মাহুত, কোন বা দ্যাশে বাড়ি রে।

আবার রানীবালা তার শ্বশুরের উচ্চারিত শিল্লুক প্রবাদ উল্লেখ করে ধারাবাহিক পরম্পরা ঐতিহ্যকে স্মরণ করায় —

উত্তম কৃষি, মধ্যম বাণ
ধিক চাকরি, ভেক নিদান!

উত্তরবঙ্গে ষাট-সত্তর দশকে অবস্থান, ক্ষোভ-বিক্ষোভ, একটা অংশের জঙ্গী হয়ে যাওয়া, তাদের চাওয়া পাওয়া সবই বৃত্তান্তে ঢুকেছে। শালগুড়ি বাগানের চারপাশ বদলে যাওয়ার সাথে সাথে রাজবংশী সমাজজীবনের ঘাত-প্রতিঘাত ঘটনার বিন্যাসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। যা সময়কালকে চিহ্নিত করে। মূলত বিশ শতকের দীর্ঘ সময়ে উত্তরবঙ্গের সমাজজীবন ও রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির সংকট অপসৃয়মানতাকে উপজীব্য করা হয়েছে উপন্যাসের পরিক্রমায়। সেখানে তাই লোকসাহিত্যের উপাদানগুলি অনায়াসে ঠাঁই পেয়ে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির বিষয়টিকে উজ্জ্বল করেছে। এই 'বর্ষাদুয়ার' উপন্যাসটি সম্পূর্ণভাবে উত্তরবঙ্গের সমাজজীবনকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর সম্পূর্ণ সময়কালটি এই উপন্যাসটির পথ ও পরিসর হলেও ষাট সত্তর দশকে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর ক্ষোভ-বিক্ষোভ, আন্দোলনকে প্রেক্ষাপট করে তিনি বিগত বিশ শতকের শেষদিকে উত্তরবঙ্গের সময়কে ইঙ্গিত করেছেন। সেইসঙ্গে রাজবংশী সমাজজীবনের পরিবর্তন, সাংস্কৃতিক সংকট ও উত্তরণের প্রয়াস সমস্ত কিছুকে উপজীব্য করে নতুন সময়ের আগমনকে সাহিত্যের ঘটনায় তুলে ধরেছেন।

দেবেশ রায়ের বহু গল্পেও রাজবংশী সমাজ জীবনের কথা ধরা পড়েছে। আটষট্টি সালের বন্যা, বর্গা অপারেশন, নকশাল আন্দোলন, ভেস্ট জমি দখল, তিস্তা নদী ও বাঁধ প্রভৃতি ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজবংশী সমাজ জীবনের লড়াই, ঘাত-প্রতিঘাতকে তিনি চরিত্র বিন্যাসের মধ্যে প্রতিফলিত করেছেন। তাঁর 'দখল' গল্পটিতে যেমন তিস্তার গতিপ্রকৃতির সাথে কিছু মানুষের চরের জমি দখল এবং চাষবাসকে ঘিরে সংঘবদ্ধ লড়াই। তিলক চন্দ্রের দখলের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তাদের ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে ড্যামনা, অরিদাস, অমনীরা তো রাজবংশী সমাজের উচ্ছেদ

হওয়া আধিয়ার ভূমিহীন বেকার যুবক। প্রজাসত্ত্বের আইনে উচ্ছেদ হওয়া আধিয়ারদের গল্প ‘দখল’-এ সে-সময়কার অবস্থানই বর্ণিত হয়েছে। ‘ধর্ণা’ গল্পে যেমন অনাহার ক্লীষ্ট বন্যার্ত মানুষ যারা ভাতের জন্য সরকারি লঙ্গরখানায় সমবেত হয়। ‘বানা’ অর্থাৎ বন্যা গল্পে যেমন তিস্তার তীরবর্তী মানুষের হাহাকার অসহায়তা ফুটে উঠেছে। সেখানে তো রাজবংশী মানুষেরও স্পন্দন আছে। ‘অনৈতিহাসিক’ গল্পেও তাই, সেখানে তিস্তার অববাহিকায় বেঁচে থাকা মানুষের লড়াই, টিকে থাকা কিংবা ভেসে যাওয়ার গল্প। সেখানেও রাজবংশী সমাজ জীবনের ছবি ধরা পড়েছে গল্পের বিন্যাসে। ‘মূর্তির মানুষ’ গল্পটিতে তো গ্রামের টটাই, যে কিনা রাজবংশী সমাজের কৃষক প্রতিনিধি ‘অবহেলিত উত্তরবাংলার অবহেলিত লোকশিল্পী’ হিসেবে মানব পুতুল সেজে একাকার হয়ে যায়। প্রফেসর কিনুর ভাবনার মধ্য দিয়ে নাগরিক সমাজের কাছে রাজবংশী মানুষের সমাজ জীবনের প্রস্তাবনা নিদারুণভাবে ধরা পড়ে। টটাই অনেকটা বাঘারুর মতো প্রতিনিধি হয়ে উপস্থাপিত হয়। ‘জোত জমি’ গল্পটিতে বর্গা অপারেশনকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। আধিয়ারদের নাম নথিভুক্তকরণ নিয়ে পিতৃপরিচয় হীন কৈলাশচন্দ্রের উচ্চারণের মধ্য দিয়ে সে সময়কার অনেক রাজবংশী কৃষকের ভূমিচ্যুত হওয়ার গল্পই ধ্বনিত হয়েছে — “এইঠে মুই কৈলাশচন্দ্র পর্বত হালুয়া। হুজুর মুই এই জমিখানের হালুয়া। মোক শিকড়-বাকড়-সুদ্ধা উপড়ান, উপড়ান হুজুর, মুই এই জমির তাল-তাল মাটি নিয়া উপরি আসিম।” ‘গীতাল যুগীনের টেকনোলজি গ্রহণ’ গল্পে ফুটীন গীদালের মধ্য দিয়ে রাজবংশী সংস্কৃতির বিবর্তমানের ছবিটা ধরা পড়েছে। ভাষা বদলে, যন্ত্রানুষঙ্গ বদলে ভাওয়াইয়া গানের আধুনিক গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবার মধ্য দিয়ে পরিবর্তনের বিষয়টি গল্পের উপজীব্য হয়ে উঠেছে।

দেবেশ রায়ের গল্পে জলপাইগুড়ি তরাই-ডুয়ার্সের সমাজ জীবন জীবন্ত হয়ে ধরা পড়েছে। সেখানে রাজবংশী সমাজ-সংস্কৃতির কথা বাস্তবতা ও বহুরৈখিক মাত্রায় উপস্থাপন করেছেন। ঘটনার বিন্যাসে তার ব্যাখ্যান ভিন্ন এক সুর, মাত্রা তৎকালীন সমাজ জীবনের প্রতিভাস হয়ে আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়। বলতে দ্বিধা নেই দেবেশ রায় উপন্যাসের মতই গল্পেও রাজবংশী সমাজ জীবন ও সংস্কৃতির চালচিত্রকে প্রধানত প্রাধান্য দিয়েছেন।

অভিজিৎ সেনের ‘দেবাংশী’ গল্পটির প্রসঙ্গও গুরুত্বপূর্ণ। এই নাটকে তেভাগার বিষয়টি যেমন প্রাধান্য পেয়েছে তেমনি আদি কৌম জনগোষ্ঠীর সংঘবদ্ধতা, প্রতিরোধ মানসিকতার

সন্ধান পাই। পাঁচের দশকের তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে গ্রামের (দক্ষিণ দিনাজপুর) সহজ সরল মানুষেরা সেতু, চৈতা, নগেন, গিদন প্রতিবাদে মুখর হয়। দাবী আদায়ে সক্রিয় হয়। সেইসঙ্গে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সচেতনতা, দেবাংশী হয়ে ওঠার দেবত্ব ও মানবিক দ্বন্দ্বের অবকাশ তাকে জারিত করে। ভূত, প্রেত মন্ত্রে বিশ্বাস ধর্মীয় পূজার্চ্চনার মধ্যে যে অসহায়তা সেটাকে তুলে ধরে আলোর সন্ধান সেটাও দেবাংশীতে স্পষ্ট হয়। সর্বোপরি রাজবংশী জনগোষ্ঠীর এক নতুন সচেতনতার যাত্রাকে ঘোষণা করে। ধর্মীয় কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাসকে নস্যাৎ করে সামন্ততান্ত্রিকতা কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ লড়াইকে (তেভাগা আন্দোলন) প্রতিষ্ঠিত করেন। এই প্রেক্ষিতে বুঝে নেওয়া যায় পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাজবংশী জনগোষ্ঠী লড়াইয়ের শরিক হয়েছে। সেখানে সমাজ ও সাংস্কৃতিক বদ্ধতা থেকে বেরিয়ে আসারও লড়াই এক পরিবর্তনকে সূচিত করে। বলা যায় রাজবংশী জনগোষ্ঠীর এক উত্তরণের পর্যায় কথা। অভিজিৎ সেনের 'দেবাংশী' তাই নিছক পুজোর পুরোহিত নয়; নতুন এক যুগপরিবর্তনের সূচনা পুরুষ।

এছাড়াও অনেকেই রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতিকে তাদের উপন্যাসের কিংবা গল্পের উপজীব্য করেছেন। সমাজ সংস্কৃতির পরিবর্তনকে সূচিত করেছেন। যেমন বিপুল দাস তাঁর 'লাল বল' উপন্যাসে ভূমিসংস্কার, অপারেশন বর্গা, আধিপত্যহীনতার বিষয়গুলি উত্থাপন করে রাজবংশী সমাজের সংকট, উত্তরণের বিষয়গুলি ধরার চেষ্টা করেছেন। আয়ুর আল প্রামাণিক, সোনামণি সরকারদের জমিদারি চলে যাওয়ার ফলে শরণার্থীদের মধ্যে জমির পাট্টা বিলির ঘটনাকে কেন্দ্র করে আর্থ-সামাজিক কাঠামো বদলের বিষয়টি এসেছে। লেখক তারই প্রেক্ষিতে বর্তমান সময়ের রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির অবস্থানকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন।

পীযূষ ভট্টাচার্য যেমন তার 'বোধন পর্ব' গল্পে পরিবর্তিত সমাজ অর্থনীতির কাঠামোয় সহজ সরল রাজবংশী যুবক বাংকার-এর চতুর হওয়ার গল্প বলেছেন। আবার কীভাবে সমাজ বদলের সাথে সাথে সাধারণ একজন লোক শিল্পী তথা সহজ-সরল, সাধারণ মানুষের মনন জগতের ছবি পালটে যায় সেটা তুলে ধরেছেন। এটাও পরিবর্তনের একটি দিক, সেটা 'বোধন পর্ব' গল্পে ধরা পড়েছে। দীনেশ চন্দ্র ডাকুয়ার 'উত্তরের গল্প'-এ রাজবংশী সমাজ জীবনের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। ভাষার প্রসঙ্গ যেমন এসেছে, রাজনীতির কথা, সমাজ ভাবনার কথা তিনি চারটি গল্পে বিধৃত করেছেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কালের রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির

প্রসঙ্গে তিনি সুন্দরভাবে অতীত কথার সমন্বয় ঘটিয়েছেন। এছাড়াও চোমংলামা, দেবাশীষ চক্রবর্তী, জীবন সরকার তাদের উপন্যাস, গল্পে রাজবংশী সমাজজীবনের কিছু কিছু দিক তুলে ধরেছেন। যা সময়ের নিরিখে পর্যালোচনার অবকাশ রাখে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় ড. চারুচন্দ্র সান্যালের 'দি রাজবংশীস অব নর্থবেঙ্গল' গ্রন্থটির নাম। এই গ্রন্থটি রাজবংশী জনগোষ্ঠীর 'সমাজ ও সংস্কৃতি' বিষয়ক আকরগ্রন্থ। নৃ-গোষ্ঠীগত পরিচয় থেকে ঐতিহাসিক পরিচয়, ব্রিটিশ আধিকারিক গবেষকদের সর্বেক্ষণ সবকিছুই ধারাবাহিকভাবে উল্লেখিত হয়েছে। পাশাপাশি বিংশ শতাব্দীতে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তিনি তুলে ধরেছেন। যদিও যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা কিংবা অন্যান্য কারণে উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চলের রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির বিষয়গুলি সন্নিবেশিত করতে পারেননি। তথাপি বলা যায় এই গ্রন্থটি রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক আকরগ্রন্থ। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এমন এক সন্ধিক্ষণে যে সময় অর্থাৎ স্বাধীনতার পরবর্তী দুই দশক পরে যে উত্তরবঙ্গের আর্থসামাজিক কাঠামোর যেমন ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে তেমনি রাজবংশী জনগোষ্ঠীও এক পরিবর্তনের মুখোমুখি হয়। জনবিন্যাসের পরিবর্তনের সাথে সাথে মনন দর্শন ও চেতনারও পরিবর্তন ঘটে। সেইসঙ্গে ক্ষোভ-বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশও একটা অংশ আলোড়িত হয়। স্বাভাবিক এই গ্রন্থটি রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির এক সন্ধিক্ষণে গ্রন্থিত। কারণ এরপরেই দ্রুত রাজবংশী সমাজ সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এমনকী ধর্মীয় সাংস্কৃতিক দিক থেকে পরিবর্তনের শরিক হয়।

উল্লেখ করতে হয় উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জনগোষ্ঠীর আরেক কৃতী সন্তান উপেন্দ্রনাথ বর্মনের নাম। তাঁর 'উত্তর-বাংলার সেকাল ও আমার জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে ধরা পড়েছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাজবংশী সমাজ জীবন, অর্থনৈতিক অবস্থা, ব্যবসা বাণিজ্য, প্রতিবেশী ভুটান দেশের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক, মেলা-উৎসব সর্বোপরি মানুষের জীবন-জীবিকা এবম্বিধ বহু বিষয়। যা তৎকালীন সময়ের রাজবংশী সমাজজীবন ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর 'রাজবংশী ভাষায় প্রবাদ- প্রবচন ও হেঁয়ালী' বিষয়ক গ্রন্থটিও রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। কারণ সে সময়ে রাজবংশী সমাজে প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচন, শিল্লুক (শ্লোক) যা লোকসাহিত্যের উপাদান হিসাবে বিধৃত করেছেন। যা তৎকালীন রাজবংশী সমাজ জীবনের মনন ভাবনার দলিল

ও লোকশিক্ষার বার্তা বহন করে। ড. গিরিজাশংকর রায়ের লোকসাহিত্যের সংগ্রহ গ্রন্থটিও (১ম ও ২য় খণ্ড) গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই সংগ্রহের মধ্যে দিয়ে সমাজ জীবনের জীবন্ত উপাদানগুলি ধরা পড়েছে। তাঁর 'উত্তরবঙ্গের ক্ষত্রিয় জাতির পূজা-পার্বণ' গ্রন্থটিতে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের রাজবংশী সমাজের দেবদেবী, পূজার আচার-সংস্কার, জীবন চর্যার রীতিনীতি, ধর্মীয় প্রভাব ও সংস্কৃতির বিষয়গুলি আধারিত হয়েছে। যা পরবর্তীকালের সময়ের নিরিখে সংস্কৃতির চালচিত্র বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থটিতে রাজবংশী সমাজের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বৃত্তের পরিসরটি আলোকিত হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে বাংলা সাহিত্যেও রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনের বিভিন্ন দিকগুলি ধরা পড়েছে গল্প অথবা উপন্যাসের বিন্যাসে, ঘটনার বিস্তারে। আমরা দীর্ঘ সময়ের পর্যায়ক্রম পরিবর্তনের বিভিন্ন দিকগুলি চিহ্নিত করতে পারি লেখকদের ভাবনার বিস্তারে, তাঁদের অবলোকন ও দৃষ্টিভঙ্গির দূরদর্শিতায়। সহায়ক হয়ে ওঠে দীর্ঘ সময়ের অবকাশে কীভাবে একটা জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত, ঘটনা কিংবা পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সমাজ সংস্কৃতির পরিসরকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। অথচ অবচেতনে আদি কৌম সত্তাকে লালন পালন করে। রাজবংশী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সেটা দেখা যায়। বাংলা সাহিত্যে তার প্রতিফলন ঘটেছে। সেটা যেমন অমিয়ভূষণ মজুমদারের কলমে প্রতিফলিত হয়েছে অনেকটা সময়কালের ব্যাপ্তি নিয়ে তেমনি দেবেশ রায়ের উপন্যাসেও স্বাধীনতার পূর্ববর্তী কয়েক দশক থেকে স্বাধীনোত্তর সময় কালের পরবর্তী কয়েক দশকের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট গ্রন্থিত হয়েছে। আর এর মধ্যেই রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির দিকগুলি, পরিবর্তনের প্রেক্ষিতগুলি চিহ্নিত হয়ে যায়।

সাহিত্য যেহেতু সমাজ দর্পণ। স্বাভাবিকভাবে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির বিষয়গুলি সময়কালের ওঠানামায় প্রভাবিত হয়েছে এবং সাংস্কৃতিক বিবর্তনের কারণ হিসাবে রাজবংশী সমাজ ও জাতিকে চালিত করেছে। তাই রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বিবর্তনের দলিল হিসাবে বাংলা সাহিত্যও গুরুত্বপূর্ণ আখ্যান ধারণ করে আছে এটা বলা যায়।

- **রাজবংশী সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি**

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রাজবংশী জনগোষ্ঠী অনেকটা সুদৃঢ় হয়। জাতিসত্তার প্রশ্নে শুধু নয় সমাজ ও সংস্কৃতির দিক থেকে অনেক বেশি সচেতন হয়ে ওঠে। মনীষী পঞ্চানন বর্মার 'ক্ষত্রিয়করণ' আন্দোলনের প্রেক্ষিতে শিক্ষা সংস্কৃতির প্রসারে অনেকে এগিয়ে আসেন। স্বাভাবিকভাবে সাহিত্য সৃজনের বিষয়েও অনেকে ব্যাপৃত হন। এই কাজটি অবশ্য পঞ্চানন বর্মা 'রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ' পত্রিকায় সম্পাদক থাকার সময়েই গুরুত্ব দিয়ে প্রথম উদ্যোগী হন। ছড়িয়ে থাকা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানগুলি (ছড়া, গান, কবিতা) সংগ্রহ করার পাশাপাশি মৌলিক সৃজনের প্রতি তিনি আলোকপাত করেন। রাজবংশী জনগোষ্ঠীর লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রটি সুদূরকাল থেকেই সুবিস্তৃত। লোকসঙ্গীত, লোকনাটকের ভাণ্ডারে গল্প, আখ্যান বরাবর ছিল, ছিল লোককাহিনির পরিসর। স্বাভাবিকভাবে সমাজ ও সংস্কৃতি বিকাশের সাথে সাথে গল্প, উপন্যাসের আখ্যানগুলি লিখিত রূপ পেতে থাকে। এ বিষয়ে বেশ কিছু বিদ্বজ্জনও উদ্যোগী হন। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে রাজবংশী ভাষা সাহিত্য চর্চার বিষয়টি বিস্তৃত হয় এবং গল্প, উপন্যাসও রচিত হতে থাকে। কবিতা নিয়ে অনেকে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা, বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে রাজবংশী ভাষায় কবিতার উর্বরতা বৃদ্ধি করতে থাকেন। আধুনিকতা, উত্তর-আধুনিকতার ভাববোধ রাজবংশী কবিতায় স্পষ্ট হতে থাকে। আট-নয় দশকে গল্প রচনার সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি কিছু উপন্যাসও প্রকাশ পায়। যার বিষয় বিস্তারে রাজবংশী সমাজ জীবনের কথা, ভাবনার কথা, বোধের বিষয়গুলি ধরা পড়ে। উপন্যাসের বিস্তৃত আখ্যানে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত সহ সমাজ অর্থনীতির বিষয়গুলি, সমাজ পরিসরের শোষণ শাসন, ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়া, ক্ষোভ-বিক্ষোভ-প্রক্ষোভ সর্বোপরি অভিপ্রায়ের বিষয়গুলি উঠে আসে। রাজবংশী সমাজ জীবনের মনন ছবিও প্রতিফলিত হয়। গল্পের বিন্যাসে ছোট ছোট বিষয়, ভাবনা, বক্তব্য, ঘটনার বিবৃতিও রাজবংশী জীবনকেই প্রতিফলিত করে। বিগত কয়েক দশকে রাজবংশী ভাষায় লিখিত সাহিত্যের পরিসরটি তাই ছোট নয়। যেখানে রাজবংশী সমাজ জীবনের ছবি, হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতির কথা এবং বিবর্তনের ছবিগুলিও ধরা পড়েছে।

সাহিত্য হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র রস। জিজ্ঞাসা, কৌতূহল ও জানার আগ্রহ মানুষকে সৃজনে উদ্বুদ্ধ করেছে। হৃদয়ের উচ্ছ্বাস অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে সাহিত্যের প্রকরণে। আবার বিশ্বপ্রকৃতি ও

সমগ্র মানব সমাজের মধ্যে প্রতিনিয়ত যে সঙ্গীতের ধ্বনি অনুরণিত হচ্ছে তার ভাষার রূপ হল সাহিত্য। অভিজ্ঞতা ও কল্পনার জগৎ মানব মনে রচিত হয় সাহিত্যের বহিঃপ্রকাশে, জীবন সংসারের বাস্তব রূপটিকে প্রতিভাত করে সাহিত্য। জীবনের বৈচিত্র্য, চিন্তার বিভিন্নতা, পরিবর্তনশীলতা সাহিত্যের গতি প্রকৃতি নির্ণয় করে। সাহিত্য ও সমাজ নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত যা পরস্পরকে আবদ্ধ করে। কখনও সমাজ জীবনের অগ্রগতি সাধিত হয় নব নব সৃষ্ট সাহিত্যের আধুনিকতায়, কখনও সাহিত্যের ধারাগুলি পুষ্ট হয় সমাজ জীবনের উপকরণ সমাহারে।

উপন্যাস আধুনিক জীবনের গদ্যকাব্য। এক তীব্র জীবনমুখীনতা এবং বাস্তব ঘনিষ্ঠতা আধুনিক উপন্যাসের সম্পদ। জীবন দর্শনের সমগ্রতাকে প্রতিফলিত করে উপন্যাস। সমকালীন জীবন ও মানুষের মানসিক স্তরকে বিন্যস্ত করে ভাষা ভাব ব্যঞ্জনায়। সাহিত্যের মূল উপকরণ তাই জীবন এবং জীবনের প্রতিবেশ। মানবজীবনের ভাণ্ডার থেকে সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা, প্রেম-হিংসা, হৃদয়বৃত্তি সমস্ত কিছুই শাব্দিক অবয়বকে প্রস্ফুটিত করে সাহিত্য। ব্যক্তি হৃদয়ের আর্তি, অভিপ্রায়, স্বপ্ন, কল্পনা ও বাস্তবকে ভর করে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা (কবিতা, গদ্য, নাটক, প্রবন্ধ, গান) গুলির সম্প্রসারণ এবং শিল্পী জীবনের উপকরণ সমূহকে উপলব্ধি ও প্রকাশভঙ্গির মধ্যে দিয়ে পাঠক সমাজের হৃদয়ে উপস্থাপিত করে। সমকাল জীবন, বাস্তবতা, রাজনীতি, ইতিহাস, নৈতিকতাবোধ সর্বোপরি সমাজবীক্ষণের সঙ্গেই সাহিত্যের মূল সখ্যতা। সাহিত্য সম্পূর্ণত নির্মাণ (constructed reality) ও সৃষ্টির সমন্বয়; মানব জীবনেরই এক উন্মুক্ত ভূখণ্ড ভূমি।

ষাট-সত্তর দশকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে রাজবংশী সমাজ জীবন বিভিন্নভাবে আলোড়িত হয়। ক্ষোভ-বিক্ষোভ, প্রতিবাদের প্রকাশ ঘটে আন্দোলনের উত্তালতায়। অবহেলা, বঞ্চনার অভিযোগ তীব্র হয়। আবার অভিবাসনের চাপে ঘনীভূত সংকটের বিষয়টিও প্রচারিত হয়। শোষণের বিষয়টিও বাদ যায় না। স্বাভাবিকভাবে জাতিসত্তার সংকট সহ সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংকটের বিষয়টি গুরুত্ব পায়। একটা শ্রেণি উত্তরণের প্রয়াস চালিয়ে যান। শিক্ষা সচেতনতা বাড়ে। বিভিন্ন পেশায় ছড়িয়ে পড়ার মানসিকতারও তৈরি হয়। পাশাপাশি একটা শ্রেণির মধ্যে মধ্যবিত্ত মানসিকতার জন্ম হয়। সংস্কৃতির প্রতি ঔদাসীন্য কিংবা হীনমন্যতা বোধও তৈরি হয়। ঠিক এই সময়েই একটা শ্রেণি সাহিত্য সংস্কৃতি রক্ষা ও উন্নয়নে ব্রতী হয়। ভাষা সংস্কৃতির উন্নয়ন, মৌলিক সাহিত্য সৃজন, পত্র-পত্রিকা-গ্রন্থ প্রকাশ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে একটি সাহিত্য

সংস্কৃতির পরিসর তৈরি হয়। সেটা ধারাবাহিক চলতে থাকে এবং ক্রমশ বেগবান হয়। স্বাভাবিকভাবে রাজবংশী ভাষায় গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, গান, নাটক লেখা শুরু করে সাহিত্য অনুরাগী একটা মহল। পাশাপাশি সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ, লোকসাহিত্যের নানা দিক, বিষয়গুলি নিয়ে ব্যক্তিগত স্তরে অনেকেই সাহিত্য সৃজন শুরু করেন। অনেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার কাজও শুরু করেন। নিয়মিত প্রকাশনারও একটা পরিসর তৈরি হয়। পর্যালোচনায় তাই দেখা যায় বিগত কয়েক দশকে সাংস্কৃতিক বিবর্তনের হাত ধরে বেশ কিছু গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ রাজবংশী ভাষায় লিখিত হয়েছে। যার বিশ্লেষণে যেমন ধরা পড়েছে সমাজ সংস্কৃতির নানাবিধ বিষয় তেমনি পরিবর্তনের কারণ হিসাবে বিভিন্ন বিষয়কে চিহ্নিত করা যায়।

বিগত কয়েক দশকে রাজবংশী ভাষায় সাহিত্যচর্চার আবহ তৈরি হয়েছে উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে। ভাষার নামকরণ নিয়ে কিছু ক্ষেত্রে বিতর্ক থাকলেও সাহিত্য অনুরাগী লেখক, পাঠক সবাই সাহিত্য সৃজনকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন। নামকরণ বিতর্কের উর্ধ্বে উঠে বলা যায় ইতিমধ্যে রাজবংশী সাহিত্য সম্ভারের বৃত্তটি ছোট নয়। একটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অন্তঃস্বর ধরা পড়ছে সময়কালকে ধারণ করে। কয়েক দশকে বেশ কিছু পত্র-পত্রিকা যেমন নিয়মিত বেরোয় তেমনি লেখক, কবি, প্রাবন্ধিকের সংখ্যাটিও উল্লেখ করার মত। বেশ কিছু গল্প, কবিতা, উপন্যাস সাহিত্য গুণ বিচারে আলোচনার দাবী রাখে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু লেখক-লেখিকা নিয়মিত সাহিত্য চর্চার মধ্যেই আছেন। তাদের লেখা সুধী বিদ্বজ্জনের বিচারে প্রশংসিতও হয়েছে। ধরে নেওয়া যেতে পারে ধারাবাহিকভাবে এই চর্চার পরিসরটি থাকলে রাজবংশী সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠতে পারবে।

উপন্যাস সমাজজীবনের দর্পণ। উপন্যাসে সমাজের সামগ্রিক ছবি ধরা পড়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে। লোকায়ত সমাজের ক্ষেত্রে উপন্যাসের বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাজবংশী উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তাই, রাজবংশী সমাজ জীবনের বিভিন্ন বিষয়গুলি ধরা পড়েছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক বিষয়গুলির সঙ্গে জীবনচর্যার বিভিন্ন অনুষঙ্গগুলি গ্রন্থিত হয়েছে। আবার পরিবর্তন সমাজের টানাপোড়েন, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, চাওয়া পাওয়া, ক্ষোভ-বিক্ষোভ আবার মানবিক মূল্যবোধের জায়গাগুলিও। ঐতিহ্য পরম্পরার বিষয়গুলি তো আছেই। পরিবর্তনের সূত্রগুলিও

আখ্যানে ব্যাখ্যানে উঠে এসেছে। সাংস্কৃতিক বিকাশের স্তরগুলি চিহ্নিত হয়েছে কখনও ভাষ্যের পরিসরে। আন্তঃসাংস্কৃতিক বিনিময়ের পর্যায়, অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন, সচেতনতা ও বিকাশ, অগ্রগতি আবার সামাজিক ক্ষেত্রে স্তর বিন্যাস, মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব, পেশা বৃত্তিগত পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়গুলি রাজবংশী উপন্যাস সাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠেছে। একটা সামগ্রিকতা এবং উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যকে অনুসরণ করে সৃজন সাহিত্যের সম্ভার হয়েছে। রাজবংশী সমাজ জীবনের গোষ্ঠীবদ্ধতা, কৃষিকেন্দ্রিক সামাজিক ও ধর্মীয়, সংস্কৃতি, সহজ, সরল প্রকৃতি নির্ভর সমাজজীবন, মনন দর্শনের পরিবর্তন উপন্যাসের বিষয় আধার হয়েও সময়কে চিন্তিত করেছে।

রাজবংশী ভাষার প্রথম উপন্যাস ‘ভকোস’ ১৩৮২ বঙ্গাব্দে প্রকাশ পায়। লেখক দক্ষিণ দিনাজপুরের মির্জাপুর গ্রামের বীরেন্দ্রনাথ রায়। রাজবংশী সমাজ জীবনের আধারে তাঁর উপন্যাসের বিষয় পরিসর বিস্তৃত হয়েছে। সমাজজীবন ও সংস্কৃতির কথা এসেছে। আবার পরিবর্তনের ঢেউ ও সংকটের কথা এসেছে। সামগ্রিকভাবে উপন্যাসের বিস্তৃত কিছু চরিত্রকে সামনে রেখে গল্প বলার ঢঙে পরিসর রচিত হয়েছে। সময়কালের বিস্তৃতি বর্তমান সময়ের আশপাশকে ঘিরে। সমাজজীবনের একটা সরল বৃত্তের ছবি ধরা পড়েছে লেখকের মনন ভাবনার টানাপোড়েনে। এসেছে জোতদার আধিয়ারদের কথা, ভূমি রাজনীতির সঙ্গে ইংরেজ সরকারের পদধ্বনি তিনি তুলে ধরেছেন। চিরাচরিত শোষণ নিপীড়নের বিষয়গুলি সংযুক্ত হয়ে উপন্যাসের বিস্তৃতি ও চরিত্রগুলিকে পরিস্ফুট করেছে। কথনের মধ্য দিয়ে রাজবংশী সমাজজীবনের ভাষ্য রচনা শুধু নয় আন্তঃসাংস্কৃতিক জটিলতা, সংঘাত জটিলতার বিষয়গুলিও ধরা পড়েছে। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী একটা দীর্ঘ সময়ের ঘটনাপ্রবাহ প্রতিফলিত হয়েছে ‘ভকোস’ উপন্যাসে। ‘ভকোস’ শব্দের অর্থ শোষণ। নামের মধ্যে ব্রিটিশ সময়কাল থেকে বর্তমান সময়ের সমাজের এক শ্রেণির শোষণতন্ত্রই উপন্যাসের বীজভাষ্য।

ভগীরথ দাস একাধিক উপন্যাসের রচনাকার। ইতিমধ্যে চারটি উপন্যাস প্রকাশ পেয়েছে। ‘সেন্দুকের ছোড়ানি’, ‘বাহে জীবন’, নিছালটিয়ার বাঁশি’ ও ‘ডাঙর আঈ’। তার লেখনীতে সময়কালের ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে। বঞ্চনার কথা, প্রতিবাদের কথা জোরালো ভাবে এসেছে। তার ‘সেন্দুকের ছোড়ানি’ উপন্যাসে চেতনাকে আঘাত করেই আখ্যান এগিয়েছে। শিক্ষিত যুবক কৃষ্ণকান্ত নিজস্ব অধিকার প্রতিষ্ঠায় চেতনার প্রতীক হিসাবে উপনীত হয়েছে। কয়েক দশক

আগের সময়কালকে তিনি ভাষ্য কথায় বিস্তৃতি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। অনেকগুলো সমস্যা, অভিবাসন সমস্যা, জমি হারানোর দুঃখ, বর্ণহিন্দুদের বিদ্বেষ, তাদের লোভ লালসা, দাবিয়ে রাখার প্রবণতার বিরুদ্ধে কৃষ্ণকান্তর ভঙ্গি ও উচ্চারণ। এসেছে কোচ রাজার কথা, গৌরবের সময়কাল, স্বাধীনোত্তর সময়ে সংকটের আবর্তে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির সংকট, জীবন জীবিকার সংকটে বিদেশ বিভুঁইয়ে ছুটে যাওয়া সবকিছুকে উপলক্ষ্য করে কৃষ্ণকান্ত মূর্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রয়াস উপন্যাসের মূল উপজীব্য। অবশ্যই বিগত কয়েক দশকের চেনা ছবিটাকে তিনি তুলে ধরেছেন। সেইসঙ্গে সংকটের মুহূর্তে দাঁড়িয়ে পরিবর্তনকে মেনে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর প্রতিজ্ঞা নিয়েই কৃষ্ণকান্তর পদচারণা। কৃষ্ণকান্তর মধ্য দিয়ে সমাজ চেতনার কথা, প্রকাশের কথা, ঘুরে দাঁড়ানোর প্রয়াসকেই সময়কালের নিরিখে এই উপন্যাসটির বিস্তৃতি স্বাধীনোত্তর সময়কালের কয়েক দশকের। সেইসঙ্গে স্মৃতি সত্তা, অতীত গৌরব পটভূমি হিসাবে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। রাজবংশী সমাজের কাছে জোরালো বার্তা দিতে চেয়েছেন। উপন্যাসের ব্যাখ্যানে ক্ষোভ বিক্ষোভ কিংবা কষ্ট দুঃখের কারণ গুলো যেমন জানতে পারা যায় তেমনি প্রতিহত করার উপায় সম্পর্কে তিনি সজাগ করে দেন। কথার বাধনীতে বিভিন্ন প্রবাদ ও শ্লোক ব্যবহার করে রাজবংশী সমাজজীবনের ধারাটি যেমন ধরতে পারি তেমনি আগামী সময়ের ডাকও শুনতে পারি। ভগীরথ দাসের এই উপন্যাসটি যথার্থই সমাজ সংস্কৃতি পরিবর্তনকে আখ্যানে সূচিত করেছে। উপন্যাসটিও কথকতার গুণে আশা জাগায়। সাহিত্য মূল্যের বিচারেও উল্লেখযোগ্য ধরে নিতে পারি। তার আরো কয়েকটি উপন্যাস আছে। তিনি একজন শক্তিশালী কবিও বটে। তার পর্যবেক্ষণ সমাজবীক্ষায় রাজবংশী সমাজের কথাগুলি বিভিন্ন আঙ্গিকে উঠে আসে, সেইসঙ্গে সময়ের ঘাত প্রতিঘাতকে তিনি মুন্সিয়ানায় তুলে ধরেছেন। আধিপত্যকামী মানুষের অভিলাষ, প্রয়াস — নাউয়াটারি গ্রামের নাম পরিবর্তনের মানসিকতা দিয়ে তিনি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। উপন্যাসটি সরল রৈখিক পথে অগ্রসর হয়নি বরং বিবিধ বিষয়ের সংস্থাপনে সেই সময়কালের রাজবংশী সমাজ জীবনের সংকট, অর্থনৈতিক চাপ তথা সাংস্কৃতিক বিবর্তনের বিষয়গুলি এক একটি শাখায় উন্মুক্ত হয়েছে। ফলে উপন্যাসের বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্য সামগ্রিকতার পরিচয় 'সেন্দুকের ছোড়ানি' তে স্থান পেয়েছে। সর্বোপরি ভাষা, শব্দ ব্যবহারে তিনি দক্ষতার পরিচয় রেখে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর বোধ ভাবনায় সর্বতোভাবে আসংলগ্ন থাকতে পেরেছেন। সেইসঙ্গে

সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিবর্তনের সময়কালকেও যথার্থভাবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন।

স্বাধীনোত্তর পরবর্তী সময়কালের সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতাকে পটভূমি করে উপন্যাস লিখেছেন তারামোহন অধিকারী ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে। তিনিও একজন গল্পকার ও শিল্পী মানুষ। ভাওয়াইয়া সঙ্গীত ও সংস্কৃতির সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক। সমাজ সচেতন একজন মানুষের লেখনীতে সমাজচিত্রের জীবন্ত ছবিই ধরা পড়বে এটাই স্বাভাবিক। তারই দৃষ্টান্ত তারামোহন অধিকারীর 'আসামী' উপন্যাসটি। উপন্যাসটিকে রাজনৈতিক উপন্যাস হিসাবেও চিহ্নিত করা যেতে পারে। কারণ ষাট-সত্তর দশকের ভাষা আন্দোলন, অধিকার আদায়ের ভাবনাকে প্রেক্ষাপট করে বিস্তৃতি পেয়েছে। প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলিও তিনি উত্থাপন করেছেন, সংস্কৃতির বিষয়গুলি এসেছে জাতির ইতিহাস অতীত গৌরবের কথা থেকে। তবে মূল বিষয় ভাষা আন্দোলন, তাকে ঘিরে জাতিসত্তার প্রশ্নে আন্দোলন, ক্ষোভ-বিক্ষোভ, অধিকারের বিষয়গুলি প্রাধান্য পেয়েছে। ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিচ্ছিন্নতাবাদীর তকমা প্রদান, ষড়যন্ত্র, জেল খাটানো, অত্যাচারের ঘটনার মধ্য দিয়ে কয়েক দশকে উত্তাল সময় পরিস্থিতি ধরা পড়েছে। রাজনৈতিক নীতি হীনতার বিষয়গুলি উত্থাপন করে একটা জনগোষ্ঠীকে অবদমিত করার চক্রান্ত, আধিপত্য কায়েমের অন্যায় অপপ্রয়াস উপন্যাসের কথনে বর্ণিত হয়েছে। সেইসঙ্গে একটা বিভেদরেখাকে অবলম্বন করে জাতিসত্তার প্রশ্নে সোচ্চার হওয়া সবই উপন্যাসের উপজীব্য হয়েছে। কিন্তু গুণে কিংবা শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যে সামঞ্জস্য থাকেনি। খানিকটা প্রতিবেদনধর্মী অভিযোগ পত্রের মত হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও এই উপন্যাসের বিষয়, ঘটনা, চরিত্র গুলির মধ্যে স্বাধীনোত্তর সময়ের কয়েক দশকের সমস্ত ছবিই ধরা পড়েছে বলা যায়। সেইসঙ্গে একটি জনগোষ্ঠীর সংকট — সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সংকটের মত বিষয়গুলি উপন্যাসের বিস্তারে ধরা পড়েছে। যা সময়কালকে চিহ্নিত করে। এখানে শিক্ষিত মন, নারান মাস্টার তাদের ভাবনাকে তত্ত্ব ইতিহাসের নিরিখে সমাজজীবনে উচ্চারণের চেষ্টার মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির চিন্তা চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করার একটা প্রয়াসও লক্ষণীয়।

প্রায় একই সময়ে লেখা ভগীরথ দাসের 'সেন্দুকের ছোড়ানী' (২০০৬ খ্রি:) ও তারামোহন অধিকারীর 'আসামী' (২০০৬ খ্রি:) — দুই উপন্যাসেই স্বাধীনোত্তর সময়কালের রাজবংশী সমাজের অস্থিরতা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপ সহ সাংস্কৃতিক সংকটকে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে

যেমন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে তেমনি বিপ্লব আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই জাতিসত্তার প্রতিষ্ঠা অধিকার আদায়ের প্রয়াসকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সেখানে সামনের সারিতে রাখা হয়েছে সচেতন শিক্ষিত যুব সম্প্রদায় এবং মাস্টার মশায়ের অগ্রগণ্য ভাবনাকে। তারামোহন অধিকারীর ‘আসামী’ উপন্যাসটি প্রতিবেদনধর্মী হয়েও সময়কালের নিরিখে সমাজ দর্শনের একটা খণ্ডচিত্র আঁকতে সক্ষম হয়েছে বলেই মনে হয়।

আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য ভগীরথ দাস ও তারামোহন অধিকারীর উপন্যাসে স্বাধীনোত্তর সময়কালের সমাজ বিন্যাস, সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন, অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক সংকট, আন্তঃসাংস্কৃতিক দেওয়া নেওয়া সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়গুলি গুরুত্ব পেয়েছে। আবার অতীত স্মৃতিচারণে বর্তমান সময়ের ঘাত, অভিঘাতকে প্রতিহত করার অভীপ্সাও জাগরিত হয়েছে। এই উপন্যাস দুটির মধ্যে ষাট থেকে নব্বই দশকের সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিবর্তনের প্রেক্ষাপট ও কারণগুলিকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি। অবশ্যই অর্থনৈতিক অবস্থাও যেখানে রাজনৈতিক ক্ষমতা সমীকরণ নির্ভর তাই এই বিষয়টি উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

আরেকটি উপন্যাস গোকুল রায়ের ‘সতীসুনীতি’ ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। নিতান্ত সামাজিক প্রেক্ষাপটে রচিত উপন্যাস। রাজনৈতিক ঘনঘটার বিষয় আশ্রয় পায়নি এই উপন্যাসে। গল্প কথনের বৃত্তান্তে মূল চরিত্র সুনীতির নিজেকে উজ্জ্বল করার গল্প। কথনে লোকজীবনের অনুষঙ্গগুলি এসেছে। আবার পারস্পরিক সম্পর্ক, স্বার্থের বিচরণ স্থির সামাজিক জীবনকে কীভাবে আলোড়িত করে তার আখ্যান। সামাজিক চৌহদ্দির মধ্যে বিচরণ নায়ক শ্রীকুমারের প্রতিষ্ঠা লাভ সুনীতির আত্মত্যাগ লোককাহিনির পর্যায়ে আবদ্ধ থেকেছে। বৈশিষ্ট্য বিচারে সমাজ চিত্রই বলা যেতে পারে। তবে ভাষা ব্যবহার ও কথনভঙ্গির বিশেষত্বে উপন্যাসটির চলন জীবন্ত সামাজিক চিত্রকে প্রতিভাত করে।

আরেকটি উপন্যাস অভিজিৎ বর্মনের ‘বাথান’ ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। এই উপন্যাসে উঠে এসেছে রাজবংশী সমাজ জীবনের বাথান সংস্কৃতির কথা। মৈষালী জীবন, দুঃখ-কষ্ট, প্রেম, বিরহ তথা ত্যাগের মননবোধ। লোকজীবনে ভাষার সম্পৃক্ততা সেটা প্রতিফলিত হয়েছে কাহিনির ছত্রে ছত্রে। শব্দ সংযোজন, প্রবাদ, শিল্লুকের ব্যবহারে উপন্যাসটির চলন হয়ে ওঠে জীবন্ত, প্রকৃতি বিচরণকারী। রাজবংশী সমাজ জীবনের বাথান সংস্কৃতির ভূমিকা, অর্থনীতির

বিকল্প উপায় হিসাবে বাথানের উৎপত্তি। তাকে ঘিরে মৈষালী বৃত্তি ও জীবন যাত্রা, উদাসীনতায় শিল্পী মনের বিকাশ রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির অংশ। এই সংস্কৃতিকে আধার করেই এই উপন্যাসের বিস্তার। বাথান, প্রকৃতি, উদাসীনতা, মনের প্রকাশই উপজীব্য হয়েছে। উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য একরৈখিক সংস্কৃতি বিষয়ক, সমাজ জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের বিষয়গুলি বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। স্বাভাবিকভাবে উপন্যাসটি সম্পূর্ণতই হারানো সংস্কৃতিকে বহন করে রচিত হয়েছে। সমাজ জীবনের একটা অতীত অংশই শুধুমাত্র লোক কাহিনির শিল্প মাধুর্যে উত্তীর্ণ হয়েছে। বিস্তৃত সমাজ জীবনের কথা ভাষ্য উপন্যাসটিতে অনুপস্থিত। আক্ষেপ আছে, বেদনা আছে কিন্তু উচাটন নেই। যা আগামী সময়কালকে অনুসরণ করে। রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির একটি সমৃদ্ধ দিক মাত্রই 'বাথান' উপন্যাসে ঘোষিত হয়েছে। অবশ্য অতীতের এক সময়কাল চিহ্নিত হয়েছে এই উপন্যাসে।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস পরেশচন্দ্র রায়ের 'বাতাসীর বাসিয়া কাথা' ১ম খণ্ড, ২০১২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। কাহিনির চরিত্রের বিস্তারে রাজবংশী সমাজের জীবন জীবিকা পরিবর্তনের আভাস ধরা পড়েছে। ছোট ছোট আখ্যান এবং খণ্ড চিত্রের মাঝে রাজবংশী সমাজের পরিবর্তিত লোকজীবনের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়েছে। ট্রিলজি ধরনের কথন বিস্তার। উপন্যাসের ভাষায় আঞ্চলিকতার টান চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তোলে। কথনের চলনে বোঝা যায় সময়ের সূচনা স্বাধীনোত্তর সময়কালের কয়েক দশক পরে। অভিবাসনের চাপে গ্রাম ও শহরের বিন্যাস যখন পাল্টে যায়, যোগাযোগ সহজ হয়ে ওঠে। শহর সম্প্রসারিত হতে থাকে গ্রামের জীবন জীবিকায়। শুধু কৃষি নির্ভরতা নয় রাজবংশী সমাজেও পরিবর্তনের ধাক্কা, প্রতিযোগিতা, টিকে থাকার লড়াই, বিভিন্ন উপায়ে রোজগারের আশায় যখন মানুষ ছুটছে, ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে অনেকে অবস্থার পরিবর্তন ঘটাচ্ছে সে সময়কার গল্প। রাজবংশী সমাজ জীবনে তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। সে সময় অধিকাংশ পরিবার অর্থনৈতিক সংকটে জেরবার হয়ে বিভিন্ন পেশায় (ধান্দা) ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে সহায় সম্বলহীন অবস্থায় বাধ্য হয় যে কোন ধরনের কাজে যুক্ত হয়ে উদরপূর্তির চেষ্টা করে। সে রকমই একটি পেশা গরুর দালালি (যেটা একসময় অন্য সম্প্রদায়ের মানুষরাই করত, রাজবংশীরা সহজে এই পেশায় যেত না) তে যুক্ত হয়ে পড়ে পেনকেটুর মত অনেকে; কেউ কেউ আবার জমির দালালির কাজে যুক্ত হয়, অনেকে এই

উপায়ে বেশ টাকা পয়সা রোজগার করতে থাকে, শহরে আধুনিকতার সঙ্গে ক্ষমতার বিস্তারে জড়িয়ে যায়। তখন অনেক শহরও সম্প্রসারিত হচ্ছিল গ্রামের দিকে। এই সময় সন্ধিক্ষণে জমি জিরেতের ব্যবসায় অনেকে দালালিতে যুক্ত হয়ে যায়। রাজবংশী বহু মানুষও এইভাবে রোজগারে নামে। খইরুল (পেনকেটুর গুরু) গরুর দালালি ছেড়ে জমির দালালিতে যুক্ত হয়ে ক্ষমতার অধিকারী হয়। পানিয়া নিতান্ত সহজ সরল ছাপোষা মানুষ। তার জমিতে সমস্যা হওয়ায় খইরুলের দ্বারস্থ হয়। সেই সুযোগের আশ্রয় নিয়ে খইরুল, পেনকেটুকে (গুরুর অধিকার নিয়ে) কাজে লাগায়। শর্তসাপেক্ষে মা কালীর সামনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে বিয়ে করতে রাজি করায় তার ভাগ্নিকে এবং এক বছর বাদে যৌতুক হিসেবে পাওয়া ৩ বিঘা জমি খইরুলের নামে রেজিস্ট্রি করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আদায় করে। পেনকেটু লোভে পড়ে চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। সহজ সরল এই গল্পের মধ্যে লুকিয়ে আছে সত্তর-আশি দশকে রাজবংশী সমাজ বদলের বীজগুলি। নগরায়ন ঘটছে, গ্রামগঞ্জের জমিও তখন মাফিয়াদের নজরে। যেখানে আড়ালে রাজনৈতিক যোগসাজস ক্ষমতা বিস্তার করে। একটা চক্র তৈরি হয়। সেই চক্রে রাজবংশী সহজ সরল মানুষও জীবন জীবিকার ধান্দায় লোভের বশবর্তী হয়। সেখানে পেনকেটুর সংস্কার, ধর্মের বিষয়টিও হাতিয়ার হয়ে ওঠে। গুরুর পরামর্শ নৈতিক ভাবে মান্য করে মা কালীর সামনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে বাধ্য হয়। খইরুল ধর্মকে সূক্ষ্মভাবে ব্যবহার করে। এখানেই সমাজ পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণ, পেনকেটু যেমন গরুর দালালি পেশায় যুক্ত হয়ে বিষময় ধান্দাবাজির চক্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে তেমনি খানিকটা নিবুর্দ্ধিতায় লোভে পড়ে। এভাবে বহু রাজবংশী মানুষ কুচক্রীদের জালে আবদ্ধ হয়ে নিজের জমিজমা, ভিটেটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। শিলিগুড়ি কিংবা অন্যান্য শহর লাগোয়া যেসব অঞ্চল আজকে নগরায়নের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেগুলি এই ধরনের বহু চক্রের জমিজমা হাপিসের গল্প ধারণ করে আছে। এই চক্রে রাজবংশী সমাজের মানুষেরাও দিশেহারা হয়ে নিযুক্ত হয়। আসলে সাত-আট দশকে রাজবংশী সমাজ সংগঠন এক অস্থির পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক চাপে অনেকেই দিশেহারা হয়ে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কাজে যুক্ত হয়ে পড়ে। শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব যেমন ছিল তেমনি চক্রব্যূহও রচিত হয়েছিল। সেখানে রাজবংশী শ্রেণির একটা অংশ লিপ্ত হয়। সামাজিক ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব, হিংসা থেকে পারস্পরিক পারিবারিক বিরোধও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়। পরেশবাবু এই সময়কালের রাজবংশী

সমাজ চিত্রটিকে তার উপন্যাসে নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। আমরা কথনে সহজে বুঝতে পারি সত্তর-আশির দশকে কিভাবে রাজবংশী গ্রাম জীবন, সমাজ জীবন এবং মানুষজন বদলাতে শুরু করে। সেইসঙ্গে পালটে যেতে থাকে নীতি, মূল্যবোধ, নৈতিকতা সাংস্কৃতিক জীবন। ক্ষমতায়নের বৃত্তে সহজ, সরল মানুষও কেমন তার চরিত্র স্বভাব বদলে ফেলে। কালো অন্ধকারের দিকে ঠেলে ফেলে দেয়। উপন্যাসটি এক সময় সন্ধিক্ষণের বার্তা দেয়। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে, শৈল্পিক ভাবনায় রাজবংশী সমাজ বদলের গতিপ্রকৃতি তুলে ধরেছেন। উপন্যাসটির দ্বিতীয় খণ্ড যেহেতু অসমাপ্ত, আশা করা যায় পরবর্তী সময়কালের সমাজ সংস্কৃতি বিবর্তনের এক দীর্ঘ ধারাভাষ্য আমরা পাব। যা সাহিত্য গুণের বিচারে আগামী সময়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে গৃহীত হবে।

রাজবংশী উপন্যাসের সংখ্যা দীর্ঘ নয়। কিন্তু যে কয়েকটি উপন্যাস ইতিমধ্যে গ্রন্থিত হয়েছে রাজবংশী ভাষা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যা যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই উপন্যাসগুলির মধ্যে থেকে আমরা পেয়ে যাই সংস্কৃতির কথা, অতীত গৌরবের কথা, ক্ষোভ-বিক্ষোভ, চিন্তা চেতনার কথা সেই সঙ্গে আগামী সময়ের প্রস্তুতির কথাও। কৃষ্ণমুখ, নারান মাস্টার, জিতেন মাস্টার-এর মতো সমাজ ভাবুকদের বিবেক চেতনার কথা। উত্তরণের গল্পও লুকিয়ে আছে কথাভাষ্যের বুনোনে। সর্বোপরি উপন্যাসের কালক্রমে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মানুষজনের লড়াই, ঘাত-প্রতিঘাত, হেরে যাওয়া, ঘুরে দাঁড়ানোর গল্পও পেয়ে যাই। সঙ্গে পেয়ে যাই ধারাবাহিক সময়কালের বিবর্তনের কথা ও সাংস্কৃতিক সংকটের খবর।

সৃজন সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় শিল্পরূপ হল ছোট গল্প বা Short Story. ছোটগল্প একান্তভাবেই আধুনিক সাহিত্য প্রকরণ। পদ্য সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত আখ্যায়িকা। যেখানে লেখকের মানস প্রতীতির সংহত প্রকাশ ঘটে সেইসঙ্গে ঘটনা, চরিত্র, পরিবেশের মধ্যে এক সম্পাদনার মধ্য দিয়ে সমগ্রতার আভাস ফুটে ওঠে। ছোটগল্পে আনন্দ, উল্লাস, বিস্ময়, সবই এক আন্তরিক প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে শিল্পরূপের পর্যায়ে উন্নীত হয়। সম্পূর্ণ এক ভিন্ন শিল্পরূপ যা আকার বা আয়তনে কিংবা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যে ছোট নয়। কবিতার মত ঐক্যভাবাশ্রয়ী নয় — কল্পনামুখ্যও নয়, সম্পূর্ণত জীবন নির্ভর। খণ্ডতার মধ্যে সম্পূর্ণতা। এই কারণে ছোটগল্পকে বলা হয় "Peculiar

Product of the Nineteenth Century."। গল্প বলা বা শোনার রীতি মানব সমাজের সুপ্রাচীনকালের সংস্কার। প্রাগৈতিহাসিক যুগেও মানুষ গল্প কাহিনি রচনা করেছে, শুনেছে। ধারাবাহিকভাবে তা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ছোটগল্প বা Short Story-র সংজ্ঞা লাভ করেছে। সেটাও সম্ভব হয়েছে আধুনিক সাহিত্যের শিল্পরূপ তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য অর্জনে। সমালোচকদের মতে এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ছোটগল্পের উৎপত্তি। তাই সমালোচকরা বলে থাকেন যে জিজ্ঞাসা চিহ্ন হয়েই ছোটগল্পের আবির্ভাব। আরো বৈশিষ্ট্যগুণে সমৃদ্ধ হয়ে সাহিত্যের অন্যতম সম্পদ হয়ে ওঠে। কথাসাহিত্যের এই জনপ্রিয় শাখা ছোটগল্পের চর্চা শুধু বাংলা ভাষা সাহিত্যে নয় বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায়ও ব্যাপ্তি পায় এবং বৃহত্তর সাহিত্যের ভাণ্ডারকে পুষ্ট করে। যা আধুনিক সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রাসঙ্গিক ও আলোচনার বিষয়। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ভাষা ও চর্চায় ছোটগল্প যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে এবং কথাসাহিত্যের এই ছোটগল্পের শাখাটি আঞ্চলিকতার সামাজিক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে ধারাবাহিকভাবে সমৃদ্ধ করে চলেছে।

রাজবংশী সমাজে গল্প বলার রীতি বহু প্রাচীনকালের। সেইসব গল্প মৌখিক সাহিত্য রূপে ছড়িয়ে আছে আধুনিক সাহিত্যে যা আজ লোকসাহিত্য হিসাবে মান্যতা পেয়েছে। রাজবংশী গল্পমালা ছড়িয়ে আছে শিশু ভোলানো ছড়া (ছাওয়া ভুলকা), হেঁয়ালি বা ধাঁধা (ছিলকা) প্রবাদ প্রবচন (শিলুক বা শিল্লুক), রসিকা গীতিকা, লোকসঙ্গীত, লোককথা (কিচ্চা)য় রাজবংশী সমাজ জীবনের গল্পের ছড়াছড়ি। এই কথা ও কাহিনির মধ্যে সমাজ গোষ্ঠীর খণ্ড খণ্ড চিত্র, মনস্তত্ত্ব জড়িয়ে আছে।

রাজবংশী ভাষায় সাহিত্য চর্চার ধারাটি কয়েক শতাব্দীর, যদিও তা মৌখিক সাহিত্যের অঙ্গনেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে কোচ-রাজ পৃষ্ঠপোষকতায় বলিষ্ঠ একটি সাহিত্য সৃজনের ধারায় সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি মৌখিক রচনার ক্ষেত্রটি উন্মুক্ত হয় এবং শাখা প্রশাখা বিভক্ত হয়ে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারাটিকে পুষ্ট করে। ব্রতকথা, গান, পাঁচালীর আখ্যানে তা মুখে মুখে প্রসার লাভ করে। রাজবংশী জনগোষ্ঠীও ধারাবাহিকভাবে এই সৃজনশীলতাকে বহমান রাখে, তুলে ধরে এই অঞ্চলের চিত্র, জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিচয়, ইতিহাস, জাতিসত্তার কথা, মনন দর্শনের ভাববোধকে। যদিও লিখিত সাহিত্য সৃজন খুব বেশিদিনের নয়। কিন্তু ভাষা শিল্পের প্রকাশ ঘটেছে ধারাবাহিকভাবে। অনেক গবেষকদের মতে সেসব উপাদান সাহিত্যের ভাণ্ডারকে পুষ্ট

করেছে, সমৃদ্ধ করেছে। ভাষাবিদ জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন যেমন ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে সংগ্রহ করার উদ্যোগ নেন তেমনি দীনেশ চন্দ্র সেন সহ অনেকেই সংগ্রহ ও গ্রন্থাগারে প্রকাশের উদ্যোগ নেন। পরবর্তীকালে মনীষী পঞ্চানন বর্মা উদ্যোগী হন উত্তরবঙ্গের ভাষাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, গান, কবিতা সংগ্রহ এবং প্রকাশের। এ বিষয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর শাখা 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ' বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৩১৩-১৩১৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বেশ কিছু শ্লোক, রূপকথা গান পরিষদের পত্রিকায় প্রকাশ পায়। পঞ্চানন বর্মা স্বয়ং বেশ কিছু রচনা ও পাদটীকা সহ প্রকাশ করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গোবিন্দ মিশ্রের গীতা, পাদটীকা (মহিলা ব্রত) সহকারে কথা ও শ্লোক, কিছু লোক গল্প যেমন - নাদিম পরামাণিকের পাঠা, জগন্নাথী বিলাই। যদিও তিনি কামতা বিহারী ভাষা হিসাবে রাজবংশী ভাষাকে উল্লেখ করেন।

বলা যেতে পারে এইসব লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা থেকে রাজবংশী ছোটগল্পের সূচনা। উনিশ শতক থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সময়সীমায় ধারাবাহিক উৎকর্ষতায় জন্ম হয় আধুনিক যুগের রাজবংশী সাহিত্য তথা ছোটগল্পের। গল্পের মধ্যে ধরা পড়ে রাজবংশী সমাজ জীবনের খণ্ড খণ্ড চিত্র, মনন কথা যেখানে ঐতিহ্য পরম্পরায় প্রবাদ-প্রবচন, লোকভাবনা সবই সহজেই অন্তর্ভুক্ত হয়। রাজবংশী ছোটগল্পের সঙ্গে লোককথা বা কিচ্চার (Folk Tale) ধারাবাহিক সম্পর্ক, সেই সম্পর্কের আধুনিক রূপ হল আজকের রাজবংশী ছোটগল্পের সাহিত্য। অনেকে লোককথা ও উপকথার নামান্তরে উদ্ধারের প্রয়াসী হলেও আজকের রাজবংশী ছোটগল্প সাহিত্য বৈশিষ্ট্যের গুণে আধুনিক হয়ে উঠেছে। রাজবংশী ভাষায় আধুনিক ছোটগল্পের সূত্রপাত আনুমানিক বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক। ইতিহাসগত ভাবে এই ষাটের দশকে রাজবংশী জনগোষ্ঠী সমাজ বিবর্তনেব ঝড়ে সমাজ সচেতন হয় এবং ভাষা সাহিত্য সৃজনে ব্রতী হয়। রাজবংশী ছোটগল্পের প্রসঙ্গে প্রথমে যে নামটি আসে সাহিত্য আকাদেমি, ভারত সরকার কর্তৃক 'রাজবংশী ভাষা সম্মান'-এ ভূষিত ড. গিরিজাশঙ্কর রায়ের নাম। তথ্য অনুসন্ধানে জানা যায় তিনি প্রথম রাজবংশী ছোটগল্প লেখেন 'মাস্টারী জীবন' ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে। ছোটগল্পের প্রসঙ্গে কিছু পত্র-পত্রিকার নাম গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। কারণ এই পত্রিকা গুলিকে ঘিরে বেশ কিছু লেখক গল্প রচনায় উদ্যোগী হন। আবার বিষয় শৈলী নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষাও চলতে থাকে। এ বিষয়ে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় 'পোঁহাতী' পত্রিকার নাম, ১৩৮০ বঙ্গাব্দে ২৭ মাঘ প্রথম প্রকাশ

পায়। বেশ কয়েক বছর নিয়মিত প্রকাশিত হয়। রাজবংশী ভাষার প্রথম এই পত্রিকায় ভাষাচার্য ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছিলেন। এরপর প্রকাশিত হয় 'পোঁহাতীয়া তারা' তারপর 'দুন্দ' নামে আরেকটি পত্রিকা প্রকাশে কয়েকজন উদ্যোগী হন। বলা যেতে পারে প্রথম পত্রিকা 'পোঁহাতী' থেকে গল্প লেখার পরিসর তৈরি হয়। ড. গিরিজাশঙ্কর রায়, বাচ্চামোহন রায় প্রমুখ কয়েকজন ছিলেন পথ প্রদর্শক। 'পোঁহাতী' সহ এই পত্রিকাগুলি প্রকাশ পায় ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি এলাকা থেকে। পরবর্তীকালে অন্যান্য জায়গা থেকে বেশ কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশ পেতে থাকে। তার মধ্যে তুফানগঞ্জ থেকে 'রায়ডাক', জলপাইগুড়ি থেকে 'বাঘধেনুক'; 'ডেগর' শিবমন্দির, শিলিগুড়ি থেকে; 'পূবালী' শিবমন্দির, শিলিগুড়ি; 'উজানী' ময়নাগুড়ি; 'ভোগা' (রাজবংশী ভাষা আকাদেমি প: ব: সরকার), 'মনসুয়া', মাথাভাঙ্গা এলাকা থেকে। তারপরে আরও কিছু পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে বিভিন্ন জায়গা থেকে। আর এইসব পত্রিকায় বেশ কিছু গল্পকার রাজবংশী ছোটগল্পের পরিসরকে সমৃদ্ধ করতে থাকে। ধরা পড়তে থাকে রাজবংশী সমাজ জীবনের কথা, জীবনের বাস্তব চিত্র, দারিদ্র্যতার বিরুদ্ধে লড়াই, সচেতনতার কথা, সমাজ বাস্তবতার কথা, সাংস্কৃতিক সংকটের কথা আবার মনোভাবের কথা সবই ছোটগল্পের বিষয় বিস্তার হতে থাকে। পূর্বে যা ছিল বংশানুক্রমে মৌখিক আলোচনার বৃত্তে তা লিখিত সাহিত্যে সাহিত্যের প্রকরণ বৈশিষ্ট্য লাভ করে উর্বর হতে থাকল।

'পোঁহাতী' পত্রিকাকে ঘিরে যারা গল্পকার হিসাবে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করতে শুরু করেন তারা হলেন ড. গিরিজাশঙ্কর রায় — যার ছদ্মনাম বাউদিয়া রায়, বাচ্চামোহন রায় (কুহুলি ছদ্মনামে লিখতেন), পরেশ চন্দ্র রায়, ভূপেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ। বাচ্চামোহন রায় ছিলেন একজন বলিষ্ঠ লেখক। সমাজমনস্ক এই মানুষটি বেশ কিছু গল্প লিখেছেন। তার মধ্যে অন্যতম 'ছোটলোক', 'উপায় আছে কিন্তুক শেষ নাই', 'ঠাই', 'কাপালির কাপাল', 'পথ কোঠে' এরকম আরও কিছু গল্প। তার গল্পে সামাজিক পট পরিবর্তনের কথা, সমসাময়িক পরিস্থিতিতে মানুষজনের দুরাবস্থা, নিবুর্দ্ধিতা, বিপদগামীতা ইত্যাদি বিষয়। তার 'ছোটলোক' গল্পে পাই জোতদারের সর্বস্বান্ত হওয়ার গল্প আর স্বার্থান্বেষী মানুষের জাতাকলে শোষিত হওয়ার কথা, সামাজিক আর্থিক পতনের বিয়োগান্তক ছবি এঁকেছেন বাচ্চামোহন তার গল্পে। 'উপায় আছে কিন্তুক শেষ নাই', 'ঠাই', 'পথ কোঠে' গল্পে আশাহত মানুষজনের হাহাকারের কথা মূর্ত হয়ে উঠেছে।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়কালের রাজবংশী মানুষগুলির হতাশাবোধ, স্বভূমিচ্যুত হওয়ার বিষয়গুলি বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে তাঁর গল্পে।

সে সময় 'পোঁহাতী'তে বেশ কিছু গল্প প্রকাশ পায়। মধুরেশ চক্রবর্তী গল্পগুলি ছিল সুখপাঠ্য, জীবনতাড়িত। ড. কালীপদ শীলের 'দুখাতির কাথা', নরেশ চন্দ্র রায়ের 'নিহাই চুন্নি দাদা' গল্প দুটি পরবর্তীকালে হরিপদ চক্রবর্তীর 'প্রান্ত উত্তরবঙ্গের উপভাষা' গ্রন্থে স্থান পায়। 'পোঁহাতী'-র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত রমেশ রায়-এর লেখা গল্প 'অবলার পিরিতি' খুবই প্রশংসনীয় গল্প হিসেবে রাজবংশী সাহিত্যে পরিচিত হয়ে থাকবে। গ্রন্থটি প্রকাশ পায় 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়' থেকে। বাচ্চামোহন রায় এবং ড. গিরিজাশঙ্কর রায় অন্যান্য পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে 'বাঘধেনুক' পত্রিকায় বাচ্চামোহন রায় একটি গল্প লেখেন 'দ্যাভর'। গল্পটিতে পরিবর্তনশীল রাজবংশী সমাজের কথা নির্মমভাবে তিনি তুলে ধরেছেন। মনচন চরিত্রের মধ্যে দিয়ে সমাজের জটিলতা, মানুষের অবস্থানগত পরিবর্তন, তথাকথিত অগ্রগতির পশ্চাতে এক শ্রেণির সর্বস্ব হারানো, ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয় মনচনের ভাবগতিতে ধরা পড়েছে। সেই সংখ্যায় আরো কয়েকজন বিশিষ্ট লেখকের গল্প প্রকাশ পায়। তার মধ্যে অন্যতম নিয়তি রায়, নগেন্দ্রনাথ রায়, বিজয়ভূষণ রায় প্রমুখ। নিয়তি রায়ের 'রিফুজী' গল্পটি ঘিরে দেশভাগের পর ওপার-এপার বাংলার প্রান্তিক মানুষজনের সংকটের কথা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ওপার বাংলার মানুষ যেমন ছিন্নমূল এপার বাংলায় আশ্রয় নেয় আর এপার বাংলার অনেক রাজবংশী মানুষ ভাগ্যান্বেষণে পার্শ্ববর্তী শহরমুখী হয়ে রিফুজীতে পরিণত হয়। ভাষার ব্যাখ্যানে আর কথনের ভঙ্গিতে গল্পটি বাস্তব ও সময়োচিত হয়ে ওঠে। নগেন্দ্রনাথ রায়ের 'উজান ভাঁটি' গল্পেও তারই প্রতিচ্ছায়া, জীবন সংকটের কথা। স্বাধীনোত্তরকালে জোতদারি উচ্ছেদ আইনে অনেক জোতদার সর্বস্বান্ত হয়ে গ্রাম দেশ ছেড়ে অন্যত্র কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হয়। সুন্দরভাবে তিনি উপস্থাপিত করেন লক্ষপতি জোতদারকে সামনে তুলে ধরে। বিজয়ভূষণ রায়ের গল্পেও সমাজ জীবনের সংকটের ভিতরকার কথা উত্থাপিত হয়েছে তার 'এখে নগতে নওয়া' গল্পে। রাজবংশী পরিবার গুলির জমি জিরেত হারিয়ে শহরমুখী হয়ে মজুরে পরিণত হওয়া, ভূমিজ কৃষি নির্ভরতা থেকে শহর নির্ভর হওয়ার বিয়োগ ব্যথার কথা গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে।

উল্লেখ্য সে সময় কয়েকটি গল্প সংকলনও প্রকাশ পায়। তার মধ্যে উল্লেখ্য নিয়তি রায়ের

‘ভোরের পখী’ রাজবংশী গল্প সংকলন। উত্তরবঙ্গ সাহিত্য পরিষদ, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশ পায় ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে। সংকলনটিতে ছিল মোট ছয়টি গল্প। নিয়তি রায়ের চারটি, একটি বীরেন রায়ের এবং আরেকটি কর্ণদেব রায়ের। নিয়তি রায় বর্তমানে একজন প্রতিষ্ঠিত লেখিকা। তার গল্পের কেন্দ্রভূমি নারী, নারীর মনোজগৎ তাদের স্বপ্ন, বিলাস, উত্থান, পতনের গল্প। তার ‘ভোরের পখী’ সংকলনের ‘চোর’, ‘ভাত’, ‘শ্যাষবেলাকার সূর্য’প্রত্যেকটি গল্পে নারীর স্বতন্ত্র লড়াইয়ের কথা উচ্চারিত হয়েছে। এগিয়ে যাবার কথা, থেমে না যাওয়া সংকল্প মনোভাবের প্রকাশভঙ্গিতে বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করার দৃঢ়তাই সমস্ত চরিত্রের মধ্যে ফুটে উঠেছে। তার অন্যান্য গ্রন্থগুলির মধ্যেও আমরা চেতনার কথা পাই, সমাজ পটভূমি পরিবর্তনের সাথে সাথে অতিক্রমণের গতিমুখে নারী শক্তির প্রকাশ ঘটেছে। নগরের ইতিকথায় যেমন ‘নয়া বাসর’, ‘মালিক’, ‘ঘাউলাদানা’, ‘হারে যাওয়া কাটাতারের বেড়া’ প্রত্যেকটি গল্পে অতিক্রমণেরই ভাষ্য, চরিত্রগুলি ভেঙে পড়েনি। তাদের কথা লেখিকা সমতলের গল্পের আধারে তুলে ধরেছেন। কর্ণদেব রায়ের ‘কাইচালুর কাচাল’ গল্পে জীবনভাষ্যের অপূর্ব বৈশিষ্ট্য কোলাজ চিত্রকল্পকে বাস্তব করে তোলে। ভাষার সৌকর্য মুগ্ধ করে। ‘ভোরের পখী’ সংকলনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য গল্প বীরেন্দ্রনাথ রায়ের ‘সতীর কাথা’। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে ‘আভংফুলের মধু’ নামে আটটি গল্পের সংকলন প্রকাশ পায়। ‘ধাউলীর ঘর মরণ নাই’, ‘ইন্টারভিউ’, ‘ছুয়াপাত ফেলানী’, ‘পেত্তানীর কাহিনী’, ‘সতীর কাথা’, ‘সাকাই’, ‘ঢ্যালা জোতদার’ আর ‘আভংফুলের মধু’। বীরেন রায়ের গল্পে সমাজ বাস্তবতায় জীবনের সুখ দুঃখ, আশা-নিরাশা-বঞ্চনা, জীবনবোধের কথা সুন্দর ভাষার বুননে উঠে আসে। চূড়ান্ত অভিজ্ঞতালব্ধ কথন যা লেখক বীরেন রায়কে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে। ‘ধাউলীর ঘর মরণ নাই’ গল্পে পিছিয়ে পড়ার কাহিনি, অর্থনৈতিক অবস্থা কিভাবে মানুষকে বাধ্য করে বাস্তুছাড়া করে তার সকরুণ উচ্চারণ। ‘ইন্টারভিউ’ গল্পে ধরা পড়ে বঞ্চনার কথা, স্বজনপোষণ দুর্নীতির কথা। ‘ছুয়াপাত ফেলানী’ গল্পে দিনজলি হল ভোজ অনুষ্ঠান শেষে এঁটো পাত ফেলানী। সঙ্গে নিয়ে আসে সে সন্তান বুধারুকে। আশা, কাজের শেষে ভোজের খাবার তাদের জুটবে। গল্পটির বিয়োগান্তক শেষে তাদের আর খাবার জোটে না। সমাজের কিছু মানুষের এক ঋণাত্মক অমানবিক চরিত্রের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। লেখক অসম্ভব দক্ষতায় শৈল্পিক সত্তা নিয়ে ছেঁচে তুলেছেন। মন ভারাক্রান্ত বিষাদময় হয়ে পড়ে। ‘আভং ফুলের মধু’

গল্পে ফুলমতী প্রতিবাদী নারী চরিত্রের প্রতীক হয়ে ওঠে। বাচ্চামোহন রায়ের গল্পে কিংবা গিরিজাশংকর রায়ের বাউদিয়া ছদ্মনামে লেখা 'ন্যান্দর বিয়াত দান পড়িল ভোটুয়া কুকুর' (অক্টোবর, ২০১৫, উজানীতে প্রকাশিত)-এ দৃঢ়চেতা প্রতিবাদী নারীর সন্ধান দেয়। নিয়তি রায়ের গল্পের নারী যেখানে অনেক স্থিতধী, অধিকার সচেতন এবং উদ্যোগী। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে তুফানগঞ্জের মিনতি অধিকারীর সম্পাদনায় রাজবংশী ভাষায় তৃতীয় গল্প সংকলন 'গল্প গোটো' প্রকাশ পায়। ষোলোটি গল্পের সংকলনে উল্লেখযোগ্য গল্প উপহার দিতে পেরেছেন মিনতি অধিকারী স্বয়ং, কমলেশ সরকার, কমলেশ সিংহ, বীরেন্দ্রনাথ রায় এবং প্রতাপ রায়। ভাষার বুনোনে প্রত্যেকটি গল্প মনোগ্রাহী ও উপজীব্য হয়ে ওঠে। কমলেশ সরকার একজন বলিষ্ঠ কবিও বটে। তার গল্পে সমাজ সচেতনতার সজাগ ভাষ্য উল্লেখযোগ্য। চতুর্থ গল্প সংকলন 'দুখাতি' প্রকাশ পায় ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে নগেন্দ্র চন্দ্র রায়ের সম্পাদনায়। রাজবংশী সমাজের উত্থান, পতন, সাংসারিক টানাপোড়েন তার মধ্যে মজা, হাস্যরসের সমাহার রাজবংশী জীবনবোধে জীবন রস উপস্থিতিকে সম্পূর্ণমাত্রায় উপস্থাপিত করেছে প্রবাদ-প্রবচন, শ্লোকের ব্যবহারে কথন বেশি বেশি করে মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। 'দুখাতি বুড়ি' কিংবা 'ছনুয়া ভিটা' গল্পে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে রাজবংশী সমাজের অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া, অসহায়, সম্বলহীন হয়ে অধঃপতন, মজুর হয়ে ওঠা সবই ধরা পড়েছে। নগেনবাবুর গল্পে দেশভাগের ফলে জনবিন্যাসের পরিবর্তন, উদ্বাস্তু রিফুজির চাপ সেইসঙ্গে স্থানীয় রাজবংশী মানুষের পিছিয়ে পড়ার ভাষ্যগুলি গল্পের বিষয় হয়ে সময়কালকে চিহ্নিত করেছে।

হরিমাধব রায় তাঁর প্রথম গল্প সংকলন 'ঢুপলুং-ঢাপলাং' প্রকাশ করেন ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে। প্রকাশক উপজুনভুই পাবলিশার্স, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার। সংকলনটিতে তার ৮টি গল্প গ্রন্থিত হয়েছে। রাজবংশী জাতির চালচলন, চিন্তা-ভাবনা, কৃষ্টি-সংস্কৃতির মনন, জীবনরসের কিছু দিক আলোকিত হয়েছে। রাজবংশী আশা আকাঙ্ক্ষা, সাংসারিক টানাপোড়েন, রাজনৈতিক চাটুকারী, দুর্নীতি, ভ্রস্টাচার, অবক্ষয়, দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ, প্রতিবাদ, ক্ষোভ বিষয়গুলি গল্পগুলির ভাষ্য হয়ে উঠেছে। 'হলাশুর পেন্টি' গল্পে যেমন এই বিষয়গুলি ধরা পড়েছে তেমনি 'যাত্রাপালা' গল্পে সমাজের অবক্ষয়, মাদক দ্রব্যের জন্য সমাজের মূল্যবোধের অবনতি, সংকটের বিষয়টি উজ্জ্বল হয়েছে। এই গল্পে উরা পড়েছে হারিয়ে যাওয়া লোকক্রীড়াগুলির কথা। 'হনুমানি সাধন' গল্পে যেমন

রাজবংশী সমাজের কৌম কৃষ্টি কৃষিকার্যের বিষয়গুলি পর্ব ধরে ধরে উল্লেখিত হয়েছে। এই গল্প সংকলনটির প্রত্যেকটি গল্পে রাজবংশী সমাজ জীবনের অতীত বর্তমানের বিভিন্ন ছবি ধরা পড়েছে। যা সময়কে চেনায় আবার উদ্বুদ্ধ করে পথ চলার নিশানায়।

পরবর্তী সময়কালে পত্র-পত্রিকা সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লেখালেখির জগতে আরো প্রবীণ নবীনের সমাগম ঘটে। বলা যেতে পারে ষাটের দশকের পর থেকে ধারাবাহিকভাবে রাজবংশী সাহিত্য সৃজনের ধারাটি বেগবান হয়। সময়কালের সঙ্গে সঙ্গে গল্পের বিষয় ও পরিসরের ব্যাপ্তি ঘটে। গল্পের মাধ্যমে জীবন খণ্ডের টুকরো টুকরো ছবি, খণ্ড খণ্ড কথন ভাষ্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, পটভূমি আধার বিন্দু হয়ে উঠে আসে। অনেকেই গল্পকার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। বলা যেতে পারে রাজবংশী ভাষার গল্পকারের সংখ্যা এই মুহূর্তেই মোটেই ছোট নয় — নিপুছা প্রামাণিক, উধাসু রায়, সুশীল চন্দ্র রায়, মণিভূষণ রায়, বিজয়ভূষণ রায়, হরিপদ রায়, প্রসেনজিৎ রায়, উমাশংকর রায়, দ্বীপেন রায়, পরেশ চন্দ্র রায়, অমল বর্মা, নন্দগোপাল রায়, গিরীন্দ্র দাস, ভগীরথ দাস প্রমুখ। এছাড়াও অনেকে নীরবে নিভৃতে সাহিত্য চর্চা করে যাচ্ছেন।

পরিশেষে একটি বিষয় উল্লেখ্য রাজবংশী ছোটগল্প যেমন সাহিত্য প্রকরণ বৈশিষ্ট্যে একটা আধুনিকতার জায়গায় পৌঁছেছে তেমনি ছোটগল্প রচনা রাজবংশী সাহিত্য পরিসরকে সমৃদ্ধ করেছে। এর মধ্যে অনেকে পরীক্ষা নিরীক্ষাও করেছেন। নতুন আঙ্গিকে নতুন ভঙ্গি ভাষায় ছোটগল্পকে বৃহত্তর সাহিত্যের অঙ্গনে তুলে ধরার প্রয়াসও নিচ্ছেন। আগামী সময়ে তার প্রতিফলন ঘটবে আশা করা যেতে পারে। কারণ বিগত কয়েক দশকের গল্প সমাহারে যে পরিবর্তনের ঢেউ, সমাজ বাস্তবতা, জীবনযাপনের কথা, লড়াই-প্রতিবাদ, সচেতনা সক্রিয়তা, এগিয়ে যাওয়ার পথ ও পরিসর আবার সংস্কৃতির গরিমা, হারানোর কষ্ট, বেদনা সবই গল্পের বিষয় আধার হয়ে উঠেছে। পরিবর্তনকে পাথেয় করেই যে সৃজন ধারা রাজবংশী সমাজে ধাবমান হয় তা সময়কালকে, পরিস্থিতি ও অবস্থানকেও সঠিকভাবে চিহ্নিত করেছে। স্বাভাবিকভাবে ছোটগল্পের পরিসরে আমরা পেয়ে যাই বিগত কয়েক দশকের দীর্ঘ আখ্যান, কথকতা এবং উত্তরণের কথালিপি, গল্পের বিস্তারে আমরা পেয়ে যাই স্বাধীনোত্তর সময়কালের রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির এক দীর্ঘ পরিচয় এবং বিবর্তনের চিহ্ন। সেইসঙ্গে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক সমাজ সংস্কৃতির পরিবর্তনের বার্তা। যা কালের নিরিখে কিংবা সাহিত্যগুণের বিচারে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সাহিত্যই

তো সময়ের দলিল, যেকোন সমাজের মনন চেতনার উন্নতি কিংবা অবনমনের উচ্চারণ। সেই জাতির সময়কালের সম্পদও বটে।

রাজবংশী ভাষায় কবিতাচর্চার ব্যাপ্তি ও পরিসরটি বিস্তৃত। কারণ কবিতা চর্চার ধারাটি সুদীর্ঘকালের প্রাচীন এবং ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে সৃজন সাহিত্যে অঙ্গীভূত হয়েছে। তবে আধুনিক কালের এই কবিতা চর্চায় একটি নতুন ধারা সেটা কাব্যগুণ, শব্দচয়ন, বিষয়, আঙ্গিক সবকিছুই রাজবংশী কবিতায় অঙ্গীভূত হয়েছে। প্রাচীন মধ্যযুগে কাব্যচর্চার গতিমুখটাও ছিল ভিন্ন। প্রাচীন যুগে রচিত লোকসাহিত্যের ছড়া, কবিতা, গান, শ্লোক (শিল্লুক), প্রবাদ-প্রবচনের ভাণ্ডারটিও সুবিশাল। মধ্যযুগে রাজন্য পৃষ্ঠপোষকতায় কাব্য সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি রতিরাম দাসের 'জাগ গান' কানাই ধামালী কিংবা পথ সাহিত্যের খোঁজ পাওয়া যায় অর্থাৎ ধারাবাহিক এক ঐতিহ্যের প্রবহমানতা আছে। যদিও সেটা অতটা বিস্তৃত ছিল না। কিন্তু সময়কালকে বিচার করলে এই ধারাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক কালে বিশেষ করে বিগত পাঁচ-ছয় দশকে রাজবংশী ভাষায় কবিতা চর্চার পরিসরটি যথেষ্টই উল্লেখযোগ্য এবং সেটার সূত্রপাতও করে যান মনীষী পঞ্চানন বর্মা। নিজস্ব সৃজন সাহিত্য (ডাংধরী মাও, ক্ষত্রিয়দের প্রতি, বেটা ছাওয়ালার প্রতি) এবং পুরোনো পুঁথি, পাঁচালী, ছড়া, শ্লোক সংগ্রহ করার মধ্য দিয়ে। এই কাজটি তিনি বিশ শতকের শুরুতেই করেন। সেখানে উত্তরবঙ্গের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতিও বিশেষ প্রাধান্য পায়। পরবর্তীকালে অনেকে এগিয়ে আসেন। উদ্ধার, সংরক্ষণ ও প্রকাশের (লিখিত) প্রয়াস শুরু হয়।

বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে এক অস্থির রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে রাজবংশী ভাষায় সাহিত্যচর্চার একটি প্রেক্ষাপট তৈরি হয়। অনেকেই ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস নিয়ে সচেতন হয়ে ওঠেন এবং সৃজন সাহিত্যের একটি পরিসর তৈরি করেন। কিছু পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থ প্রকাশেরও উদ্যোগ হয়, পাশাপাশি সাহিত্য চর্চার ধারাটিও বেগবান হয়। সেই ধারায় রাজবংশী ভাষায় কবিতা সাহিত্যর সম্ভারটি কিন্তু সমৃদ্ধ হয়। সেখানে আধুনিকতার বৈশিষ্ট্যগুলি সংযুক্ত হয়। বেশ কিছু লেখক লেখিকারও আগমন ঘটে।

এই সময়েই ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের দিকে ড. গিরিজাশংকর রায় প্রকাশ করেন 'সাতভাইয়া' শীর্ষক একটি কবিতার সংকলন। সাতজন কবির কবিতা। বাসুদেব সেন, রাধানাথ দাস, কলীন্দ্রনাথ বর্মন, বিনোদবিহারী বর্মন, হেমকান্তি রায় প্রধান, তুষার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাউদিয়া রায়

(গিরিজাশংকর রায় স্বয়ং নিজে ছদ্মনামে)। ‘সাতভাইয়া’ কাব্যগ্রন্থে তিনি সংযোজিত করেন তার ‘ময়নামতী’ কাব্য আখ্যানের সঙ্গে চর্যাপদ, বৈষ্ণব পদাবলী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিস্কৃতি কবিতার রাজবংশী ভাষার অনুবাদ সমূহ। এই ‘সাতভাইয়া’ সংকলন গ্রন্থটি রাজবংশী ভাষায় সংকলিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ। দেখা যায় ‘সাতভাইয়া’য় সংকলিত কবিতার বিষয়বস্তুর মধ্যে নতুনত্ব, সমাজ সচেতনতা, জাতির প্রতি আবেদন, সুখ-দুঃখ, অভাব-হতাশা, নারীর অভীপ্সা, প্রকৃতি ভাবনা ভিন্নতর কাব্যময়তায় ধরা পড়ে। এই সংকলনে কবি তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেশ কয়েকটি কবিতা অর্ন্তভুক্ত হয়েছে। অসামান্য গঠন শৈলী ও কবিতাবোধের অধিকারী এই মানুষটি বাংলা কবিতার পাশাপাশি বেশ কিছু রাজবংশী কবিতা রচনা করেন। যে কবিতাগুলি রাজবংশী ভাষা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে। তার ‘অললই ঝললই মাদারের ফুল’ কাব্যগ্রন্থটি তো রাজবংশী কবিতা সাহিত্যের অন্যতম একটি গ্রন্থ। রাজবংশী ভাষায় অ-রাজবংশী কবির প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ যেমন তেমনি রাজবংশী ভাষায় রচিত একক কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ এই ‘অললই ঝললই মাদারের ফুল’। প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে। তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায় চরিত্র বাস্তব হয়ে ওঠে শব্দ ব্যঞ্জনার উপযুক্ত প্রয়োগ, উপমার ব্যবহারে। পরিচিত পরিবেশ ও ভাবনাকে তিনি রূপময়তায় ভরিয়ে তুলে জীবন সংলগ্ন করে তুলেছেন। তার কবিতায় গীতিময়তার স্পর্শ ছত্রে ছত্রে। তুষার বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন রাজনৈতিক সচেতন মানুষ, সেই বক্তব্যকে তিনি শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষের জীবনযন্ত্রণার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন কবিতার পঙক্তিতে। যেমন —

এলা হামরালায় পরদেশী হয়ে আছি ...
কাথালা ভাবিলে বুকখানোতে অগুন জ্বলি উঠে
হাতগিলা বড় বাঁশার নাখান শক্ত হয়া যায়
হামার আগিলা পুরুষ নাকি আজা ছিল্
বাউদিয়া বৈরাগীর মতন হামরা এলায় ...
ভিটার জমি, হাল-গরু বেচায়া হাত পাতেছি
মহাজন ব্যাপারী সগারে হাড্ডি শুষি খাছে ...
পুরানা দিনগালা চোখু বুজিলে ভাসি উঠে
গাঁওলা এলা ধুধুয়া পাথার, নিধুয়া শ্মশান।

তুষার বন্দ্যোপাধ্যায় সমকালীন রাজবংশী সমাজজীবনের ছবি নিখুঁত ভাবে তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে সেই সময়কালে রাজবংশী সমাজের অর্থনৈতিক দুরবস্থা, অভিবাসনের চাপে অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন, চিরাচরিত ভূমিজ ব্যবস্থার পরিবর্তনে রাজবংশী পরিবারগুলির সর্বস্বান্ত হওয়া সবকিছুই ধরা পড়েছে। ক্ষোভ-বিক্ষোভ মানসিক অবস্থার হদিশও আমরা তার কবিতায় পেয়ে যাই। বস্তুত তুষার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কবিতায় বিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়কালের কয়েক দশকের রাজবংশী সমাজ মননের ছবি যেমন এঁকেছেন তেমনি পরিবর্তনের ধাপগুলিকে চিহ্নিত করেছেন।

তার কবিতায় চরিত্ররা উঠে এসেছে জীবন্ত হয়ে। প্রকৃতি সন্নিবেশিত হয়ে উপমায় ধরা পড়েছে জীবনচর্যার প্রাত্যহিকী এবং চিরায়ত সংস্কৃতির ছবি। 'হালুয়ার চিন্' কবিতায় যেমন —

হালুয়ার চিন্ আইলের দাতিৎ
মাহুতের চিন্ পাগেলা হাতীৎ
জালুয়া বান্ধে খালতে আলি ...
খোলুয়ে চিন্ দ্যায় শোল-বোয়ালি
বৈদ্যের গুণখান্ জ্বরের ঝোকায়
গাছের চিন্খান ফলের থোকায়
রূপসী নারীর না নাগে গয়না
পাখির সেরা টিয়া আর ময়না।

তাঁর কবিতামুখ গীতিময়তায় রাজবংশী সমাজের ভাওয়াইয়া সঙ্গীতকে আবদ্ধ করে। চিত্রকল্পের সমৃদ্ধতায় রাজবংশী সমাজ জীবনের স্পন্দন অনুভূত হয় নিবিড়ভাবে 'হালুয়ার শোভা লাঙ্গল গোরু' কবিতায় যেমন পংক্তিতে পংক্তিতে ধরা পড়েছে -

দিনের শোভা সুরজের বাতি
রাইতের শোভা চান,
হালুয়ার শোভা লাঙ্গল গোরু
জমিনের শোভা ধান।

...   .

...   .

মরদ মানষির শোভারে ভাই
খোলা বুকের ছাতি,
ঘরের শোভা বাড়ে যদি
কইন্যা রূপবতী।

কলীন্দ্রনাথ বর্মন ছিলেন সমাজ সচেতন মানুষ। কবিতায় তার সমাজ হিতৈষণার বিষয়টি বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। যথার্থই তিনি সমাজ সাহিত্য নিয়ে সজীব ছিলেন, তার 'রাজবংশী অভিধান' সংকলন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যা রাজবংশী ভাষা সাহিত্যের ফলক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। কবিতায় তিনি সেই সমাজ সচেতনতারই সাক্ষর রেখেছেন। 'হামার উত্তরবাংলা', 'জাতির চিকনভাষা', 'আপন পায়ে দাড়াও', 'কিতায় এই দুর্গতি', 'মাথাগনতি' কবিতার নামের মধ্যেই তার ভাবনা ও বোধের পরিচয় উঠে আসে। আবার নারীর অভীপ্সা, আর্তিও তিনি কবিতায় আবদ্ধ করেছেন মননশীল মানসিকতায়। 'গাভুর চেঙেরির খেদ' কবিতায় সেটা প্রকাশ পেয়েছে। কলীন্দ্রনাথ বর্মনের কবিতায় আধুনিকতার ছাপ ছিল স্পষ্ট, ছন্দ শব্দ সুরের সাথে পরিচিত উপমা ও শব্দ শুনে মানুষের চেতনা আবেগকে স্পর্শ করা বা নাড়া দেওয়ার প্রয়াস তার কবিতায় মূর্ত হয়েছে। 'জাতির চিকন ভাষা' কবিতার ছত্রে তাই দেখা যায় -

নদীর চিকন বান বরিষণ
বালুর চিকন বাও
নারীর চিকন সোয়ামী পরিজন
ছাওয়ার চিকন মাও।
ভুইয়ের চিকন আলি
ভেমরুলের চিকন বাসা
মানষির চিকন শালি
জাতির চিকন ভাষা।

মানষি বাঁচিয়া রয়াও
জাতি মরে কোন বেলা?
ভাষা, সংস্কৃতি কৃষ্টি
ভুলিয়া যায় যেই বেলা।

কলীন্দ্রনাথ বর্মন ছিলেন একজন পণ্ডিত মানুষ, একজন সমাজ কর্মী এবং রাজনীতিবিদ। একাধিক ভাষা জনতেন। তার কবিতা সংকলন 'নয়া ডেগর' বস্তুত রাজবংশী কবিতায় নতুন পথের দিশারী ছিল এই কাব্যগ্রন্থ।

হেমকান্তি রায় প্রধান ছন্দে, সাধারণ শব্দবন্ধে কবিতায় বার্তা দিতেন যেখানে ব্যক্তিগত পরিসর থেকে সমাজ চেতনা, জাতি-ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি দরদ ধ্বনিত হয়েছে। অসম্ভব দক্ষতায় তিনি লেখেন 'মাদেরেঙ্গার চিঠি' শিরোনামে একাধিক কবিতা সেখানে দীর্ঘ কবিতাও বৈশিষ্ট্য গুণে নতুন ধারার সৃষ্টি করে। সমাজ জীবনের ভাবনার কথাও তিনি কবিতার সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন —

শতেক যুগের কেচ্ছা দুঃখের
পুত মরা মার ব্যাথা
কায় লেখিবে মুই মরিলে
হামার আঙ্গী-এর কাথা?

এখানে তো আহ্বানই ধ্বনিত হয়েছে। নিজের কথা ভাবনা হয়ে উঠেছে সামগ্রিক। তাঁর বেশ কয়েকটি কবিতা 'সাতভাইয়া'য় সংকলিত হয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে রাজবংশী সমাজের নিবিড়তা, সাংস্কৃতিক জীবনে যে সুর, ছন্দ, রূপ, মাধুর্য সর্বোপরি জীবনরস হেমকান্তি রায় প্রধানের কবিতায় আবদ্ধ হয়েছে। কবিতায় তিনি যেমন বার্তা প্রদানের ভঙ্গি সম্পৃক্ত করেছেন তেমনি কবিতায় গল্প সংবদ্ধ করেছেন নিপুণ বৈশিষ্ট্যে। কবি হেমকান্তি রায় প্রধান অসংখ্য কবিতা লিখেছেন কিন্তু সংরক্ষণের অভাবে যা আজ স্মৃতিসম্ভার মাত্র। তিনি হরিমোহন বর্মন সম্পাদিত 'উত্তরবঙ্গ' পত্রিকা সহ জলপাইগুড়ির সুধীরঞ্জন বিশ্বাস সম্পাদিত 'উত্তরবাঙলা'; বারবিশা, জলপাইগুড়ি, বিনোদবিহারী বর্মন সম্পাদিত 'জাগরণী' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। অনেকেই তাকে রাজবংশী ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি বলে মনে করেন। রাজবংশী সাহিত্যে পত্রকাব্য যেমন তাঁর অভিনব সংযোজন

তেমনি সাহিত্য সমালোচনা রাজবংশী ভাষা সাহিত্যে হেমকান্তিই প্রথম শুরু করেছিলেন। এই কাজটি তিনি করেন বাউদিয়া রায়ের 'ময়নামতী' কাব্যের সমালোচনার মধ্যে দিয়ে। একটি বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ্য যে আধুনিক কালে যে কয়েকজন রাজবংশী ভাষা সাহিত্যে চর্চা শুরু করেন তার মধ্যে হেমকান্তি রায় প্রধান অন্যতম ব্যক্তিত্ব এবং অনেক উত্তরসূরী তৈরি করার পেছনে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এমনকী বাউদিয়া রায়ের মধ্যে তিনি শিক্ষক হিসাবে সাহিত্যের বীজ বপন করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়কালে রাজবংশী ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অগ্রণী পথিক এবং পরিবর্তনের একজন কাণ্ডারীও বটে।

বাউদিয়া রায় তাঁর কবিতায় সমকালীন সমাজভাবনাকে বাঙ্ময় করেছেন। তাঁর কবিতায় নমনীয়তার সুরে ঘোষণা আছে, আহ্বান আছে আবার কাব্য গুণ বৈশিষ্ট্যকে তিনি অব্যয় হিসাবে মান্য করেছেন। যার প্রতিফলন তার চর্যাপদ, বৈষ্ণব পদাবলীর অনুবাদ কৃত্যে ঘটেছে। তার 'রাজবংশী' কবিতায় যেমন সূক্ষ্ম বার্তা আছে —

দুনিয়ার হাটে সগায় বসিয়া
যাছেরে বেসাতি করি,
স্বপনের ঘোরে এলাও আছিত্
নরম শেষাতে পড়ি?

কিংবা

নিন্ তোর এলাও ফুরায় না
আল্সি এলাও সাত্?

প্রশ্নবোধক চিহ্নের মধ্যে শুধু আহ্বান নয় তীর্যক শ্লেষও তিনি ছুঁড়ে দিয়েছেন জেগে ওঠার আশা নিয়ে। কবিতায় তিনি প্রাণকে যুক্ত করেছেন মননশীলতার ভাবগভীরে গিয়ে। এই বার্তা প্রদানও সেই সময়কালীন অবস্থায় জরুরি ছিল। সেটাকেও তিনি চিহ্নিত করেছেন কবিতার মধ্যে। এই জাগরণের আহ্বান তার সমাজবোধের প্রাজ্ঞতাকে স্মরণ করায়। অনুবাদ কর্মেও তিনি এই দক্ষতা ও উপলব্ধিকে সমাগত করেছেন অনায়াসে —

এই দেহার গড়ত পাঁচকিলা ধান
চনমন মনে সোন্ধায় কায়।

মাপিয়া নেক্ মাহাসুখ পোক্ত করিয়া,
এই গিয়ান আর্জেক গুরুকে পুছিয়া।
সমাধি মারিয়া তোর কিবা ফল হবে,
সুখ-দুখের মরণ তুই এড়াবো কি ভাবে?
ভবলীলা সুখের আশা ছাড়েক তুই,
শূন্যের পাখে পাও বাড়া কছে যে লুই।
পিড়া বানানেক তায় ধমন-চমন,
ধ্যানোতে জানিলো লুই বিচার হিমন।
(লুই পাদের "কায়া তরুবর পঞ্চ কি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল।" - পদের অনুবাদ।)

বাউদিয়া রায়ের কবিতায়ও গল্পের বিস্তার লুকিয়ে থাকে। 'কাজল-ভোমরা', 'নয়ানশ্বরী', 'বাউদিয়া' শীর্ষক কবিতায় গল্পের ভাষ্য রচিত হয়েছে শব্দ ছন্দের প্রকরণে। 'ময়নামতী' কাব্যে তারই প্রতিফলন ঘটে বিস্তারে। বাউদিয়া রায় ওরফে গিরিজাশংকর রায় অন্যতম ব্যক্তি যিনি আধুনিক রাজবংশী ভাষা সাহিত্য চর্চার গতিপথ নির্ণয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। লোকসাহিত্য থেকে গদ্য সাহিত্য, কবিতা প্রবন্ধ, রচনা সহ গ্রন্থ প্রকাশ সবেতেই তিনি আধুনিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। 'প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গ : লোক সাহিত্য (প্রথম পর্ব)' ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে এবং 'প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গ : লোক সাহিত্য (দ্বিতীয় পর্ব) ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন। প্রথমটিতে রাজবংশী ভাষা ও ছড়া এবং দ্বিতীয়টিতে রাজবংশী উপকথাগুলি সংকলিত করেন। সমকালীন পরিস্থিতিকে পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করে তিনি ভাষা সাহিত্য চর্চার উপর যেমন গুরুত্ব আরোপ করেন তেমনি আধুনিক সাহিত্যের গুণাবলী সম্পর্কে সচেতন হয়ে বিস্তারের প্রয়াস চালিয়ে যান। বলা যেতে পারে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি আধুনিক রাজবংশী ভাষা সাহিত্যের গতিমুখ নির্ণয়ে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছেন। কয়েক দশক ধরে নিরলস রাজবংশী ভাষা সাহিত্য চর্চায় যুক্ত থেকে তিনি রাজবংশী সাহিত্য সংস্কৃতির যুগ সময়কেও চিহ্নিত করেছেন।

একটি বিষয় উল্লেখ্য রাজবংশী ভাষা সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে অ-রাজবংশী কবি, লেখকরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। কবি তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম যেমন গুরুত্বের সঙ্গে

আসে তেমনি বাসুদেব সেনের নাম উল্লেখ করতে হয়। তিনি শুধু কবিতা চর্চা নয় একজন লোকশিল্পী ছিলেন। আবার প্রকাশনার ক্ষেত্রে বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী সচেতনভাবে এগিয়ে এসেছিলেন। এ প্রসঙ্গে যেমন 'উত্তরবাঙ্‌লা' পত্রিকার নাম যেমন করতে হয় তেমনি পরবর্তীকালে 'পোঁহাতী' পত্রিকার ক্ষেত্রেও দেখা যায় বহু অ-রাজবংশী সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ এগিয়ে এসেছেন। বেশ কয়েকজন গল্পকারের নাম যেমন জানতে পারি তেমনি সুবীররঞ্জন বিশ্বাস (সম্পাদক, উত্তরবাঙ্‌লা), অবনীন্দ্রপ্রসাদ সিংহ প্রমুখদের নাম আসে। 'পোঁহাতী' পত্রিকার সঙ্গে তো সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. চারুচন্দ্র সান্যাল, ড. হরিপদ চক্রবর্তী, ড. নির্মল কুমার বসু প্রমুখ পণ্ডিতবর্গও বিভিন্নভাবে যুক্ত ছিলেন। বিশ শতকের ষাটের দশকের পরবর্তী সময়কালে সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন রাজবংশী সমাজের ক্ষেত্রেও দেখা যায় সেখানে অরাজবংশীরাও সমানভাবে এগিয়ে এসেছিলেন। সমাজ সচেতন মানসিকতা ও পারস্পরিক মেলবন্ধনের ছবিই যা থেকে স্পষ্ট হয়। স্বর্গীয় হরিশ চন্দ্র পাল যেমন ভাওয়াইয়া সংস্কৃতির জন্য এগিয়ে এসেছিলেন তেমনিভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তর, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ রাজবংশী ভাষা সাহিত্য চর্চার পরিসরকে সমৃদ্ধ করেছেন।

বাচ্চামোহন রায় যেমন একজন প্রতিষ্ঠিত গল্পকার ছিলেন তেমনি একজন সমাজ সচেতন কবি হিসাবেও পরিচিত ছিলেন। রাজনৈতিক বোধ বীক্ষাকে গুরুত্ব নিয়ে ইতিহাস, সংস্কৃতি গ্রামজীবন, প্রকৃতির সন্নিবেশ তাঁর কবিতার বিষয় হয়ে উঠেছে। তিনিও 'পোঁহাতী' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আবার পরবর্তীকালে তিনি 'উজানী' পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। তার প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'আসোল ঘাটা'। তার কবিতার ছত্রে ছত্রে সময়ের স্পন্দন প্রতিফলিত হয়েছে। 'মোর এই আবাহন', 'নিশিনা', 'এইটায় হামার গান' কবিতাগুলির মধ্যে দিয়ে তার সমাজ বদলের স্বপ্ন, চেতনার স্তুতি ও অভিপ্রায় প্রকাশ পায়। রাজবংশী কবিতা সাহিত্যে তার ভূমিকা আধুনিকতার নিশানা। শ্যামাপদ বর্মনও রাজবংশী ভাষা সাহিত্যে আরেকটি উল্লেখযোগ্য নাম। তিনি শুধু কবি নন, একজন গীতিকারও বটে। তার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'চান্দের হাসি ম্যাঘের কোলত।' তিনি বেশ কিছু আধুনিক ছড়াও লিখেছেন রাজবংশী ভাষায়।

সত্তর-আশির দশকে রাজবংশী সমাজের সামাজিক পরিবর্তন, অর্থনৈতিক সংকট এবং সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা রাজবংশী সমাজকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। অনেকে ভূমি থেকে বিচ্যুত হয়ে

কাছে দূরের শহরে-নগরে বিভিন্ন বৃত্তি পেশায় ছড়িয়ে পড়ে। একটা অংশের মধ্যে সাংস্কৃতিক উদাসীনতা দেখা যায়, গ্রামে সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকবৃন্দেরাও (জোতদার পরিবার) কেউ কেউ সর্বস্বান্ত হয়ে শহরমুখী হয়। আবার এই সময়ে সমাজ সচেতনতাও দেখা যায় একটা অংশের মধ্যে। শিক্ষার বিষয়ে আগ্রহ তৈরি হয়। এক চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার মধ্যে রাজবংশী পরিবার সমাজ নতুন করে ভাবতে বাধ্য হয়। এই সময়ে তথাকথিত একটা শ্রেণি সমাজ সংস্কৃতি, সাহিত্য নিয়ে ভাবতে শুরু করে। বলা যায় এই সময়ে গিরিজাশংকর রায়, কলীন্দ্রনাথ বর্মন, ধর্মনারায়ণ বর্মা, বাচ্চামোহন রায়ের মত কতিপয় ব্যক্তিবর্গ পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থ প্রকাশকে ঘিরে রাজবংশী ভাষা সাহিত্যের পরিসরে আবদ্ধ হন। পরবর্তীকালে নয়ের দশকে ভাষা সংস্কৃতি চর্চার মধ্যে দিয়ে সামাজিক-সাংস্কৃতিক এমনকী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডও শুরু হয়। বিভিন্ন সংগঠনও তৈরি হয়। কিন্তু যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হল ভাষা সংস্কৃতির বিষয়টি, বেশি গুরুত্ব পায়। অনেকে সচেতন হয়ে ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চায় যেমন উদ্যোগী হন তেমনি সংঘবদ্ধভাবে আধুনিকতার অনুসারী হন। পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন। পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থ প্রকাশের পরিসরও তৈরি করেন। লোক সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানগুলি সংগ্রহ, সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ, জাতিসত্তার কথা, আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় অনেকে ব্রতী হন। এই প্রচেষ্টা শুধু উত্তরবঙ্গে নয় নিম্ন অসমের বিস্তৃত অঞ্চল, বিহার, নেপাল থেকেও শুরু হয়। স্বাভাবিকভাবে এই সময়কালটি রাজবংশী ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, একটা সংঘবদ্ধ প্রয়াসের অভিমুখ তৈরি হয়। বিস্তৃতিও পায় সময়কালের প্রেক্ষিতে। পরিবর্তনের ধারাও সূচিত হতে থাকে। তালিকাটি তারই প্রতিফলন —

রাজবংশী ভাষার বই, রাজবংশী বিষয়ের বইয়ের তালিকা [২৬]

(ক) কাব্য, কবিতা, গান, গীত ...

	লেখক	বই	প্রকাশক	সন	দাম
১.	তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়	অললই ঝললই মাদারের ফুল	জীবন বাগচী, গ্রন্থভারতী জলপাইগুড়ি	১৯৭৭	৪৲
২.	গোকুল রায়	নোখোলিয়ার বাঁশি	মানিক বর্মন, জলপাইগুড়ি	১৩৮৭	৫৲
৩.	সন্তোষ সিংহ (সম্পাদক)	সোনার লাঙ্গল রূপার ফাল (কবিতা ফোল্ডার)	ঋষ্যমুখ প্রকাশন, মাথাভাঙ্গা	১৯৮৮	

৪.	বীরেন রায়	উত্তরবঙ্গের ফুল্লরা পোহাতি	উত্তরবঙ্গ সাহিত্য পরিষদ, কদমতলা, দার্জিলিং	১৯৮৮	২০ ৲
৫.	নগেন্দ্রনাথ রায়	হোকোলখোলি	তরণীকান্ত রায়, লোকসাহিত্য প্রকাশনী	১৯৮৮	৪ ৲
৬.	বীরেন রায়	যুগের হাওয়া বদলে গেইছে	তিলক বর্মন, দার্জিলিং	১৯৯০	৭০ ৲
৭.	বীরেন রায়	কর্ণবধকাব্য	মাধুরী রায়, কদমতলা, শিলিগুড়ি	১৯৯১	৮ ৲
৮.	বিনোদবিহারী বর্মন	দিন যায় রাতি যায়	নীলদিগন্ত, তুফানগঞ্জ	১৯৯৫	৬ ৲
৯.	যতীন বর্মা	একনা মানষি চায়	নীলদিগন্ত, তুফানগঞ্জ	১৯৯৫	৪ ৲
১০.	বিনোদবিহারী বর্মন যতীন বর্মা (সং)	রাজবংশী কবিতা সংকলন	নীলদিগন্ত, তুফানগঞ্জ কুচবিহার	১৯৯৬	৪০ ৲
১১.	অনন্ত রায়	কামতা কাব্য	মহেন্দ্রনাথ দাস, নটবর নবরত্ন কমিটি	১৯৯৬	৩৫ ৲
১২.	সুজন বর্মন	বুক ভাঙে মোর নদীর দৈন্যা	দিশা নিকিলন, ভাটিবাড়ি, জলপাইগুড়ি	১৯৯৬	১৫ ৲
১৩.	নগেন্দ্রনাথ রায়	শ্রীশ্রী গীতাআয়ী (অনুবাদ কাব্য)	গুরুসৈত্য প্রকাশনী	১৯৯৮	৫১ ৲
১৪.	যতীন বর্মা	কবিতায় মোর ভাতের শাক	রায়ডাক প্রকাশন, তুফানগঞ্জ	১৯৯৮	৫ ৲
১৫.	সুশীলচন্দ্র রায়	দুঃখিনী কামতা আঈ	বীরবাহাদুর ছেত্রী	১৯৯৯	১০ ৲
১৬.	সুশীলকৃষ্ণ পাল (সম্পা)	ওকি গাড়িয়াল ভাই	দি মাইক সাপ্লাই, কোচবিহার	১৯৯৯	৩০ ৲
১৭.	শ্যামাপদ বর্মন	সুজন সোনার ঘাট	লেখক	২০০০	২০ ৲
১৮.	হরিমোহন বর্মন	বেকার	তুষার বর্মন, রাঙ্গালীবাজনা, জলপাইগুড়ি	২০০০	১০ ৲
১৯.	অমূল্য দেবনাথ	এই নীলুয়া দ্যাওয়ার তলোৎ	নর্থবেঙ্গল কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন, কোচবিহার	২০০০	২০ ৲
২০.	সুজন বর্মন	সুখ চান্দায় হায় সুখের হাবিলাস	দিশা নিকিলন, ভাটিবাড়ি, জলপাইগুড়ি	২০০০	২৫ ৲
২১.	তপন-সন্তোষ (সম্পাদিত)	উত্তুরা বাও	পঞ্চানন প্রকাশনী, ঠাকুরপাট, জলপাইগুড়ি	২০০১	১০ ৲
২২.	নগেন্দ্রনাথ রায়	চণ্ডালিকা (অনুবাদ কাব্য)	উত্তরবঙ্গ ইতিহাস, পরিষদ, জলপাইগুড়ি	২০০২	৩০ ৲
২৩.	সুভাষচন্দ্র রায়	ইশাবাষ্য উপনিষদ	শ্রীউপাসু	২০০৩	২৫ ৲
২৪.	দীনেশচন্দ্র সিংহ (সম্পাদিত)	রাজবংশী জাতির তেপুন্না গীত সংগ্রহ	বিশ্বজিৎ দেবশর্মা	২০০৩	১০ ৲

২৫. কমলেশ সরকার (সম্পাদিত)	উত্তরবঙ্গের জাগের গান	নর্থবেঙ্গল কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন		৪
২৬. হরিমোহন বর্মন	আবোনাতি	চিত্রা বর্মন, রাঙ্গালীবাজনা, জলপাইগুড়ি	২০০৪	৮
২৭. তপন রায়প্রধান দিলীপ বর্মা (সং)	রাজবংশী কবিতা সংগ্রহ	দীপ প্রকাশন, কল-৬	২০০৪	৯০
২৮. সন্তোষ সিংহ	কবিতা কুঙ্কুরার সুতা	সাহিত্য ভগীরথ	২০০৪	২০
২৯. শ্যামাপদ বর্মন	গীতি সংগ্রহ	প: ব: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী গবেষণা কেন্দ্র	২০০৪	৫০
৩০. প্রেমানন্দ রায়	কুসুমকালের কবিতা	নর্থবেঙ্গল আকাদেমি অব কালচার	২০০৫	১০
৩১. মনোজ কুমার সিংহ	বুকের মাটি	ঐ	২০০৫	১০
৩২. তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়	তিস্তা-তোর্ষায় উজান ভাটি	দৌড় প্রকাশ, কল-১২৭	২০০৬	৪০
৩৩. কমলেশ সরকার (সং)	গেয়ান গীতা	নয়া, তুফানগঞ্জ	২০০৬	৭
৩৪. কমলেশ সরকার	ডাকনাম (১ম খণ্ড)	লেখক	১৪১৩	১২
৩৫. অভিজিৎ বর্মন	ঘাণ্টিফুলের কটপ	রাজবংশী একাডেমী	২০০৭	৪০
৩৬. অভিজিৎ বর্মন	ঢেসা ধানের সমাই	রাজবংশী একাডেমী	২০০৭	৪০
৩৭. অভিজিৎ বর্মন	শাক তুলিনু বেছি কুছি	রাজবংশী একাডেমী	২০০৮	৪০
৩৮. বাচ্চামোহন রায়	আসোল ঘাটা	রাজবংশী একাডেমী	২০০৮	৩০
৩৯. বসন্ত বর্মন	অভিমান	রাজবংশী একাডেমী	২০০৮	৪০
৪০. নগেন্দ্রনাথ রায়	রাজবংশী গুরুগীতা	রাজবংশী একাডেমী	২০১০	৬১
৪১. অভিজিৎ বর্মন	তোরে বাদে	রাজবংশী একাডেমী	২০১১	৫০
৪২. ড. নিখিলেশ রায়	কালনাত্তির কবিতা	রাজবংশী একাডেমী	২০০১	৪০
৪৩. ড. নিখিলেশ রায়	উকাশের উককথা	রাজবংশী একাডেমী	২০০৬	২০
৪৪. জ্ঞানবিলাস যৌষিৎরঞ্জন রায়	কটোপ	পাইকান বুকস ভেটাগুড়ি, কোচবিহার	২০১৪	৪০
৪৫. অমূল্য দেবনাথ	ন্যাওটা জীবন	নিউ জেনারেশন পাব. মাথাভাঙা, কোচবিহার	২০১৪	১০০
৪৬. ক্ষীরোদচন্দ্র দাস	তোমার মোর দুঃখের চিঠিগুলা /	লেখক	২০১৪	১০০
৪৭. ধৃতিশ্রী রায়	মুই নারী মুই নদী	পাইকান বুকস	২০১৬	৬০
৪৮. প্রসেনজিৎ রায়	চড়োক মেলা	পাইকান বুকস	২০১৬	৮০
	শিমিলার ফুল	পাইকান বুকস	২০১৬	৮০
	সাত আটটা রঙ	পাইকান বুকস	২০১৬	৮০
৪৯. কমলেশ সরকার	বাঘ বাঘিনী ফুলটুসি	রাজবংশী ভাষা প্রসার সমিতি	২০১৬	৪০
	ফুলপরী	নয়া সাহিত্য বাসর ভেলাপেটা, তুফানগঞ্জ, কুচবিহার	২০১৫	৮০

(ক) অভিধান, প্রবন্ধ, নিবন্ধ ...

১.	কলীন্দ্রনাথ বর্মন	রাজবংশী অভিধান	বীরেন্দ্রনাথ রায়, রাঙ্গালীবাজনা জলপাইগুড়ি	১৩৭৭	৫৲
২.	উপেন্দ্রনাথ বর্মন	রাজবংশী ভাষায় প্রবাদ প্রবচন ও হেঁয়ালি	জিতেন্দ্রনাথ রায় অজিতকুমার বর্মন	১৩৮৬	২০৲
৩.	খগেন্দ্রনাথ রায়	কামতাপুর ইতিহাসের আলোৎ (প্রাচীন যুগ)	উমাপদ রায়, মুন্সিপাড়া শালকুমার হাট, জলপাইগুড়ি	১৯৮৮	২৲
৪.	হরিপদ রায়	জয় বাবা জল্পেশ	হরিপদ রায়	১৯৯৪	১০৲
৫.	হরিপদ রায়	সংস্কৃতির মিলনৎ : বাবা জল্পেশ	লেখক	১৯৯৫	২০৲
৬.	ধর্মনারায়ণ বর্মা	কামতাবেহারী ভাষায় ব্যাকরণ ও রচনা শিক্ষা	অসিতকুমার বর্মন	১৯৯৫	৭৲
৭.	গুণধর বর্মন	কামতাপুরের ভাষা, কৃষ্টি, ইতিহাস	সুরঞ্জন রায়, চৌহদ্দী, গাড়িয়ালটারি, ডাউকিমারী, জল	১৯৯৯	১০৲
৮.	মণীন্দ্রলাল কুণ্ডু	তুলনামূলক বঙ্গীয় রাজবংশী ধাঁধা	মনুজেন্দ্র কুণ্ডু, শিলিগুড়ি	১৯৯৯	৪৫৲
৯.	ধর্মনারায়ণ বর্মা	কামতাপুরী ভাষা সাহিত্যের রূপরেখা	রায়ডাক প্রকাশন	১৪০৭	১২৫৲
১০.	গুণধর বর্মন	কামরূপ কাথা	সতীশচন্দ্র রায়, শিমলাবাড়ি, জলপাইগুড়ি	২০০০	
		আগিলা কাথা	ঐ		
১১.	সুখমন্ত বর্মন	কোচবিহারের লৌকিক শব্দকোষ		২০০০	
১২.	শচীন্দ্রনাথ বর্মন	কামতাপুরী ভাষাতত্ত্ব (ফোল্ডার)	কামতাপুরী ভাষা সাহিত্য পরিষদ	২০০০	৩৲
১৩.	হরিমোহন বর্মন	কামতাপুরী ভাষা	অপর্ণা বর্মন	২০০১	৭৲
১৪.	দীনেশচন্দ্র সিংহ	নয়া জমিদারী	লেখক	২০০২	৭৲
১৫.	ধর্মনারায়ণ বর্মা	কামতাপুরী ভাষা প্রসঙ্গ	রায়ডাক প্রকাশ	২০০২	৩০৲
১৬.	রঞ্জনা রায়	উত্তরবঙ্গ ভাষা সমস্যা	চিত্তরঞ্জন বর্মন	২০০২	
১৭.	হরিপদ রায়	আগিলা দিনের কথা (১ম)	হরিপদ রায়	২০০২	১২৲
১৮.	ধীরেশ চন্দ্র রায়	ছনছে ছনছে কাথা	প্রফুল্ল কুমার রায়, গোসাইহাট	২০০৩	৮৲
১৯.	হরিপদ রায়	দুই চাইর কাথাৎ রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মার জীবনী	প্রফুল্লকুমার রায়	১৪১০	৬৲
২০.	হরিপদ রায়	পাছিলা ফিরি দেখা	লেখক	২০০৪	৮৲
২১.	ড. দীপক কুমার রায়	মনীষী পঞ্চানন ও অসম	রাজবংশী একাডেমী	২০০৯	৫০৲
২২.	ড. নিখিলেশ রায়	সম্পাদকীয়	রাজবংশী একাডেমী	২০০৭	৪০৲
২৩.	সুজন বর্মন	কামতাপুরী অভিধান	কামতাপুরী ভাষা উন্নয়ন পরিষদ, দিনহাটা, কোচবিহার	২০১১	৭৯০৲
২৪.	তারামোহন অধিকারী	ভাষা আন্দোলনের গরজ ক্যানে	মিনতি অধিকারী হরিপুর লাঙ্গল গ্রাম, কোচবিহার	২০১২	৮০৲

২৫.	দীপককুমার রায়	রাজবংশী সমাজ আরো সংস্কৃতির কথা	সোপান ২০৬, বিধান সরণী, কল - ৬	২০১২	১০০্
২৬.	যোগেন্দ্রনাথ দাস	উখকতার উখকতা	লেখক, আলিপুরদুয়ার	২০১৪	৮০্
২৭.	প্রসেনজিৎ রায়	ফুলে ফুলে ভরিয়া ভরফুল	পাইকান বুকস	২০১৬	৮০্
২৮.	ভগীরথ দাস	এক নজরে বীর চিলা রায়	পাইকান বুকস	২০১৬	৪০্

(গ) নাটক, নাটিকা ...

১.	রামেশ্বর রায়	পুরান ভিটা	অমিত রায়	১৯৯৬	১৫্
২.	হরিমোহন বর্মন	সেচায় সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ	তুষার বর্মন	১৯৯৮	৬্
৩.	হরিমোহন বর্মন	ভারত কাথা	তুষার বর্মন	১৯৯৯	৭্
৪.	খুশী সরকার	ঋণ-তেভাগা		২০০৩	২০্
৫.	খুশী সরকার	আয়েরা শাল বনের তেপুন্না	রেখা সরকার	২০০৫	১০্
৬.	খুশী সরকার	চল পরির যাই	রেখা সরকার	২০০৫	২৫্
৭.	সন্তোষ সিংহ	খুটার বিলাই	অম্লানজ্যোতি ডাকুয়া	২০০৫	২৫্
৮.	আনন্দমোহন রায়	কমরেড আশারু	নিড্ডারু প্রকাশনী বীরপাড়া আলিপুরদুয়ার	২০১৫	১১১্
৯.	প্রসেনজিৎ রায়	দালান বাড়ি	পাইকান বুকস	২০১৬	৬০্

(ঘ) গল্প / উপন্যাস

১.	গোকুল রায়	সতী-সুনীতি (উপন্যাস)	পরেশচন্দ্র রায়	১৯৮১	১০্
২.	হরিমোহন বর্মন	বড়াইর বটুয়া (Folk tale)	অপর্ণা বর্মন, রাঙালিবাজনা	১৯৮১	৪্
৩.	বীরেন্দ্রনাথ রায়	আভং ফুলের মধু (গল্প)	কাবেরী কর্মকার, সঞ্চয়িতা, প্রসন্ন নগর, জলপাইগুড়ি	১৯৯৭	১২্
৪.	হরিমোহন বর্মন	বেড়ানির কাথা (ভ্রমণ, গগয়াখণ্ড)	অপর্ণা বর্মন রাঙালিবাজনা, জলপাইগুড়ি	২০০০	৭্
৫.	বীরেন রায়	ভোকস (উপন্যাস)			
৬.	সুভাষ নাথ	বুনসিড়ির ঢক (গল্প)	মালতী নাথ	২০০১	৫্
৭.	হরিপদ রায়	গল্ফর ঝপা	লেখক	২০০২	৩০্
৮.	কমলেশ সরকার	কাগা-টুনির কিচ্চা	নয়াপ্রকাশ, নাটাবাড়ি, কুচবিহার	২০০৩	২০্
৯.	মিনতি অধিকারী (সম্পাদিত)	গল্পগোটা (গল্প)	রায়ডাক, তুফানগঞ্জ, কুচবিহার	২০০৩	৬০্
১০.	নগেন্দ্রচন্দ্র রায়	দুখাতি (গল্প)	কমলা রায়, হিরন্ময় রায়	২০০৩	৩২্
১১.	হরিপদ রায়	ঘরজেয়া (গল্প)	লেখক	২০০৫	২০্
১২.	শচীমোহন বর্মন	আগোছালো পৃথিবী (গল্প)	নন্দবালা বর্মন		১০্
১৩.	হরিমোহন বর্মন	বেড়ানির কাথা (ভ্রমণ)	নীরদকুমার রায়, রাঙালিবাজনা	২০০৫	৮্

১৪. ভগীরথ দাস	সেন্দুকের ছোড়ানি	ফ্রিক, কুচবিহার	২০০৬	৩০
১৫. অভিজিৎ বর্মন	বাথান (উপন্যাস)	রাজবংশী একাডেমী	২০০৯	৮০
১৬. হরিমাধব রায়	ঢুপলুং-ঢাপলাং (গল্প)	উপজনভুই পাবলিশার্স মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার	২০১৬	১৩০

এই সময়কাল থেকে একঝাঁক সার্থক কবির আবির্ভাব ঘটে। যাদের কবিতায় সময়কালের প্রতিধ্বনি সহ সমাজ জীবনের কথা, উত্তরণের ভাবনা তথা ভাষা সাহিত্যের গৌরব রক্ষা ও সম্পৃক্তায়নের প্রয়াস দেখা যায়। যতীন বর্মা, নিখিলেশ রায়, কমলেশ সরকার, সুজন বর্মণ, অমূল্য দেবনাথ, সন্তোষ সিংহ, তারামোহন রায়, অভিজিৎ বর্মণ, প্রেমানন্দ রায় প্রমুখ। এদের কবিতায় আধুনিকতার বোধ সংযুক্ত হয়। কবি নিজেই অনুভবে একাত্ম হওয়ার সাথে সাথে সমাজ চেতনায় ব্যাপ্তি ঘটায়। সেইসঙ্গে গতিময়তা — যতীন বর্মা, তারামোহন অধিকারী, অমূল্য দেবনাথ কিংবা সুজনের কবিতায় সেটা ধরা পড়ে। যতীন বর্মার 'একনা মন' কবিতায় যেমন ধরা পড়েছে —

'ত্যাঙো একদিন চান ডুবি গেইল
পঙ্খির ঝাক উড়ি গেইল বৈদ্যাশে
রসিকে না করে দোতারা বাজেয়া
                ভাওয়াইয়া গান
ও হাইল্লার সাথুয়াক না ড্যাকায় টিয়ারি হাকে
দোতারা-কুষান গানত না হয় এলা ফ্যাসা।
মানষি উক্টায় লৈক্ষ মানষির ভিতিরা
                একলা মন
হউক না ক্যানে কাঙাল মন
হাউরিয়া মন, মাওরিয়া মন
মানষি উক্টায় লৈক্ষ মানষির ভিতিরা
একটা পিরিতি মাখা মন।

তার অন্যান্য কবিতার 'কবিতায় মোর ভাতের শাক', 'আয় আমরা ঠ্যাং বাড়াই', 'উমার পীরিতির

টানে’ কবিতাগুলিতেও সেই একই আভাস, গীতিময়তার সুর। কবি কমলেশ সরকারের কবিতায় প্রতিবাদের ভাষা অন্তর্হিত থাকলেও গীতিময়তায় তিনি যেমন সময়, অবস্থান, পরিস্থিতিকে সুন্দরভাবে ধরেছেন তেমনি নিজেকেই শরিক প্রতিপন্ন করে বোধের সন্ধান করেছেন। ‘কবি তুমি’ কবিতায় শুধু নয় অন্যান্য কবিতায় তারই প্রতিফলন দেখতে পাই। কমলেশ সরকার একজন শক্তিশালী কবি, বাংলাভাষার কবিতায়ও তিনি স্বাচ্ছন্দ্য। কবিতায় তার মনোবেদনা, প্রতিবাদ কখনও কখনও ধ্বনিত হয়েছে। সুজন বর্মণ একজন যত্নশীল কবিই শুধু নন তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত প্রাবন্ধিকও বটে। তবে ‘কামতাপুরি অভিধান’ একটি উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যা রাজবংশী ভাষা সাহিত্যের প্রসারে ভীষণ জরুরি ছিল সময়কালের নিরিখে। তার একাধিক কাব্যগ্রন্থও আছে। সমাজ হিতৈষী ভাবনা ও জাতিসত্তার বিষয়ে তার অত্যন্ত সংবেদনশীল মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে কবিতায় শব্দবন্ধে। অমূল্য দেবনাথের কবিতায় জাতির অবনমন, পরিচয় হারানোর ব্যথা, আবেগ কষ্ট ধ্বনিত হয়। সেখানে জড়িয়ে থাকে ক্ষোভ, বিক্ষোভ, মনোবেদনা ও তার ‘এই নিলুয়া দ্যাওয়ার তলৎ’ কাব্যগ্রন্থে ‘পরিচয়’ কবিতার মধ্যে ধরা পড়েছে।

> ‘যদি মোক পুচ করেন
> তোমরা কায়।
> মুই কইম
> মোক কামাই দ্যাও বাবু কামাই উক্টাং।’

চেতনাকে আঘাত করে কঠোর কঠিন বাস্তবতাকে কবিতায় ধরেছেন। ‘হাত দুকান ইতিহাস গড়ায়’, ‘ইমরা কি মরি যাইবে’ কবিতায় যেমন মর্মন্তুদ ক্ষোভের কথা উচ্চারিত হয়েছে তেমনি প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য, মাধুর্যও তার কবিতায় ধরা পড়েছে।

প্রেমানন্দ রায়, তারামোহন অধিকারীর কবিতায় আর্তি আছে, খেদোক্তি আছে। তারামোহন অধিকারীর কবিতায় বৌদ্ধিক বিদ্রোহের আভাস আছে। সময়ের করাল স্রোতে চেতনার বিকাশ, সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার মুহূর্তকে সচেতন থাকার বার্তা, অর্থনৈতিক উত্তরণের ভাবনা সবকিছুই কবিতায় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্মৃতি, সত্তা, ভবিষ্যতের ভাবনায় এক ধরনের আবেশ রচনা করার ক্ষমতা তারামোহন অধিকারীর কবিতায় পেয়ে যাই। প্রেমানন্দ রায়ের কবিতাতেও অনুভবী কষ্ট, আবেগে, উচ্চারণে ঘুরে দাড়ানোর প্রয়াস দেখা যায়। তার

'মাটি মাও আর ভাষা' কবিতায় যেমন -

মাটি যেলা ডেক্‌চি উভুর করি লেপি দেওয়া হয়
সেলা উয়ার নাম নেওয়ালি।
মাটি যেলা কপালত ডপ ডপ করি চিতি দেওয়া হয়
সেলা উয়ার নাম তিলক।
মাটি যেলা বসত গড়ে চাতরের চাইর ঘর
সেলা উয়ার নাম ভিটা।
মাটি যেলা সোনার জিরাইত ফলায় —
এমাথা ও মাথা খালি সোনার বরণ
সেলা উয়ার নাম জমিন।
চাইর পহর রাতি জাগি থাকি থাকি
হালুয়া স্বপন দেখে কত কি রঙীন

কবি প্রেমানন্দ রায়ের কবিতাতেও এই ধরনের আবেশ ছড়িয়ে থাকে। জাতিসত্তার জন্য, ভাষার জন্য আবার সৌন্দর্য চেতনায় স্বদেশ, স্বজন আন্তরিক উচ্চারণে হাত বাড়ায়। কবিতাই কথা বলে ওঠে।

বিগত শতকের আট-নয় দশকের সময় মধ্যবর্তী কালটুকু রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের ক্রান্তিকাল, সংকটজনক সময়। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেও গুরুত্বপূর্ণ। বলা যেতে পারে এই সময়কালেই রাজবংশী সমাজের সামগ্রিক বিবর্তন ঘটতে শুরু করে। চিরাচরিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিন্যাস ভেঙে যায়। পেশা বৃত্তির সম্প্রসারণ ঘটে। অবনমনই ঘটে বলা যায়। চূড়ান্ত এক প্রতিযোগিতার মধ্যে টিকে থাকার লড়াই জমাট বাধতে থাকে। রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলাও বৃহত্তর এই জনগোষ্ঠীকে বিভ্রান্ত করে। জোতদারি বিলোপ আইন, ভূমি সংস্কার-অপারেশন বর্গা, তে-ভাগা আন্দোলন অভিবাসনের স্রোত, জনবিন্যাসের ব্যাপক পরিবর্তন, রাজবংশী সমাজের ভূমিচ্যুত হওয়া দারুণভাবে আলোড়িত করে। এই সময়েই ভাষা-সংস্কৃতি নিয়ে আন্দোলন, সচেতনতার জাগরণ, প্রতিবাদের ভাষা হিসাবে উঠে আসে। একটা অংশ অতি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং আরেকটা অংশ গভীর নিষ্ঠায় মননশীলতাকে সম্বল

করে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় মনোনিবেশ করে। সমাজকে জাগরণের পথ অনুসন্ধানে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চাকে হাতিয়ার করে। বেশ কিছু পত্র-পত্রিকা (বাঘধেনুক, ডেগর, রায়ডাক) প্রকাশের পাশাপাশি সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সূচনা ঘটে, আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে। বাচ্চামোহন রায় সহ সন্তোষ সিংহ, নিখিলেশ রায়, কমলেশ সরকারের মত বেশ কয়েকজন কবি কলম ধরেন। নিখিলেশ রায়, সন্তোষ সিংহের কবিতায় বলিষ্ঠতা সবার নজরে আসে। সমাজ চেতনায় গভীরতা, উপলব্ধি, ভাবাবেগকে ছাপিয়ে প্রতিবাদের ভাষা হয়ে ওঠে। আট-নয়ের দশকটি রাজবংশী ভাষা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ সময়, প্রতিষ্ঠার জেদ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ভাষা কবিতায় বাধা পড়ে। সন্তোষ সিংহের কবিতা 'কবিতা কুঙ্কুরার সূতা' এই সময়ে কবিতা ফোল্ডার। দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্তে'র বাঘারুকে তার কবিতায় মূর্ত করে তোলেন, প্রশ্নের বানে তিনি সমাজ সংসারে নিজের অবস্থানকে চিহ্নিত করেন দৃঢ়তায়, কবিতার শব্দবন্ধের ক্ষমতায় 'মোর গাঁও মোর মাও' কবিতায় সেটাই উচ্চারিত হয়েছে -

"হামরা যেলা হামার নাকান চলি
হামরা যেলা ঠাকুর পঞ্চাননের কতা কই
সেলা হামরা সাম্পোদায়িক, বিচ্ছিন্নতাবাদী, কামতাপুরী —

হামার সউক গোলমাল হয়া যায় —
"আচ্ছা, হামরা কায়?"
হামরা যেলা ডাক্তার হই, ইঞ্জিনিয়ার হই
বড় অফিসার হই
সেলা সগায় হামাক 'কোটা'-র জোর দেখায়
সেলা হামরা নিবুদ্ধিয়া তপশিলি —
হামার খুব ধন্দো নাগি যায় — 'হামরা কায়'?
হামরা সাম্পোদায়িক, বিচ্ছিন্নতাবাদী, কামতাপুরী —
না গণতান্ত্রিক ভাল্ মানষি, না বাহে, আজবংশী
তপশিলি না বাঙালি।"

সেই সময়কালের সমাজ বিবর্তনের সংকটকালে জরুরি প্রশ্নটি কবিতায় ধরা পড়েছে। ক্ষোভ - বিক্ষোভের উৎস সন্ধানে জাতিসত্তার প্রশ্নে, সমাজ জীবনে রাজবংশী মানুষের অবস্থান ও সামগ্রিক মনোভাবকে কবিতায় জবাবদিহি করেছেন। আবার নিজের কাছেও নীরবে প্রশ্ন রেখে আত্মমর্যাদা বোধের ভাবনায় জারিত হয়েছেন, জারিত করেছেন বৃহত্তর সমাজকে। ঘুরে দাড়ানোর বার্তাও তাঁর সাহিত্যকর্মে অনায়াসেই উপলব্ধ হয়। এরকম বেশ কিছু কবিতা তিনি লিখেছেন আবার গ্রাম, সমাজের প্রতি নিবিড় ভালোবাসার কথাও শুনিয়েছেন —

"তুই কায়? তোক কেনেবা চিনায় যায়ছে না।
তুইকি মোর মাও?
মাথাটা হইছে পখির ভাসা
খ্যাসেরে বিরাইচে অগ্ —
শীদলের আওটার নাকান, ভুরভুরা চুরার নাকান গাও —
তুই কায়? — মোর দুখিনা মাও।"

তার শব্দচয়ন, উপমার ব্যবহার অসম্ভব কুশলী শিল্পী মনের পরিচয় দেয়। কবিতা ভাষ্য হয়ে গল্পের বিস্তার ঘটায় সমাজ বাস্তবতাকে প্রখর দৃষ্টি হেনে। ভোট সর্বস্ব রাজনীতির অবস্থাকে কবিতায় তিনি ধরেছেন নির্মমভাবে। কারণ গ্রামগঞ্জের সহজ সরল মানুষদেরকে নিয়ে প্রতিশ্রুতির ফাঁদে ফেলার করুণ বাখ্যানও তার কবিতার সম্পদ। যেমন —

" — এ সোমারু, মুই যেদু জিতোং
তোর ছাওয়াটা ট্টনা হবে
তোর নেংটি খান ধুতি হবে
তোর বুকের বাতা ঢাকা যাবে
তোর খসখসা গাও ছলছলা হবে
তোর ঝামটা দাতোত্ বসেয়া দিম্ নিশি ...।"

কিংবা

"বছর গিলা ঘুরি গেইল ... নাউয়ের গছ্টা বড় হইল্
নাউয়ের গছে ফুল হইল ... সেই ফুলে নাউ হইল্

নাউ হয়া পুরাট হইল্ ... পুরাট নাউয়ের বস্ হইল্
সেই বস্ বৈরাগী নিয়া হইল্ দেশান্তরী
— ওই যে তোমরা চলি গেইলেন
ওই যে তোমরা কয়া গেইলেন
আর আইস্লেন না ...।”

কবিতায় যুক্তি, ব্যাখ্যা, শ্লেষ এবং উপমায় অসামান্য দ্যোতক হিসাবে বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছে। আধুনিকতার স্বরে প্রতিবাদও উচ্চকিত কিন্তু নমনীয়তার গুণে গভীর ভাবনায় নিমজ্জিত করে। আবার আত্মসমালোচনা, নিজের সত্তার প্রতি বিশ্লেষণ ও সমাজ মনস্কতাকে ছড়িয়ে দেয়। প্রতিবাদের ভাষার মধ্যেও নিজস্ব সত্তাকেও দাঁড় করিয়ে তার রচনায় নিজের চেতনাকেও কেন্দ্রবিন্দু করা তার আধুনিকতার পরিচয়। ‘মনটা কয়’ কবিতায় সেটাই ধরা পড়েছে। সমসাময়িক সমাজ বাস্তবতা ও সমাজ ভাবনাকেও কবিতায় ধরেছেন - ‘ডাওয়াপাড়ির কথা’ ‘অক্তমাখা কাইব্য কাহিনী’ ‘লোহার ফুটবল’, ‘দেওয়ালীর কোটা’, ‘পাথর’, ‘তুষের আগুন’, ‘শূন্য শেযাতে’ ‘শঙ্কিনী’ কবিতাগুলির মধ্যে নিজের রাজবংশী সমাজের দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ, জীর্ণতাকে অনায়াসে তুলে ধরেছেন। আবার সমাজচিত্রকে তুলে এনে তৎকালীন সময়ের রাজবংশী সমাজের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎকে সীমাবদ্ধ করার লক্ষণও লক্ষ করার মত। তার কবিতার আধুনিক উচ্চারণ ভবিষ্যৎ পরবর্তী প্রজন্মের পথ ও পরিসরকে প্রশস্ত করে।

আরেক কবি নিখিলেশ রায়। রাজবংশী কবিতা সাহিত্যের নতুন পথের দিশারী। তার কবিতার মধ্যে গভীর মননশীলতার ছাপ যেমন স্পষ্ট তেমনি সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস চেতনার বিষয়গুলি অত্যন্ত নিবিড়ভাবে উঠে এসেছে। ভাষা-সংস্কৃতি চর্চার পরিসরে আত্মপ্রকাশের সঙ্গে জীবনযাপন, স্বভাবধর্মের বিষয়গুলিও পরম যত্নে তিনি কবিতার বিষয় করে তুলেছেন। আমরা সমাজজীবনে পরিষ্কার ছবি পাই। তার কবিতা আধুনিকতার বৈশিষ্ট্যগুণে উজ্জ্বল। প্রতিবাদের ভাষার মধ্যে চূড়ান্ত বলিষ্ঠতার প্রকাশ ঘটেছে শব্দ ব্যঞ্জনার গুণে। প্রতিক্রিয়ার প্রকাশে সংযম, সংবেদনশীলতা সমীহ জাগায়। ‘কালনাত্তির কবিতা’ (২০০১) গ্রন্থের কবিতায় ধরা পড়েছে সময়ের স্পন্দন —

“আন্ধার পড়িলে মধ্যনাত্তিত যেদু কুকুর ভোকে
ও ঘর থাকি মাও কয় — মানষি বিরাইছে কতা রে! কুকুর নাগচে

কুকুর নাগার কতা না হয় বুঝিলুং
কিন্তু মানষি বিরায় ক্যাং করি
সেখেনা বুঝিতে আরো ভালেদিন নাগিচে
কুকুর নাগিলে মাগোর কথায় জাগি নচি আমরা গোটায় নাত্তি

... ...

... ...

কুকুর নাগুক আর না নাগুক এলা সমসমায়
মাও ছাড়া এই কতাটা কায় আর এ্যামন করি জানিবে।

এই গ্রন্থের আরেকটি অসামান্য কবিতা 'আলো'। কবি নিজে চেতনার ভরকেন্দ্র হয়ে সমাজ ভাবনার প্রেক্ষিতে আলো জ্বেলেছেন —

মনে মনে মুই একেনা আলো আকোং
সেই আলোখুনা আস্তোকে হয়
পইলা পইলা ঘুবিয়া ঘুবিয়া নাকোং
ইলায় যেদু উনাক ফোকের কয়!

আলো পোষা কি যেমন তেমন কতা!
কোটে যায় নিন, কোটে বা প্যাটের ভাত
আলোখুনা যেদু বুকত বত্তি রয়
পাছে থো তোর শীদল ছ্যাকারও স্বাদ!

হাওয়া দেয় এদি, হুড়কা আর এক দিয়া
এদি ঝরি পড়ে, ওদি থিক থিকা কুয়া
তার মইধ্যত আলোখুনা কাপি ওঠে
কাশিয়াবাড়িত ওঠে হুক্কা হুয়া।

বাড়ি, বাড়ি সেই আলো খুনা বাটি দিম
প্যাটের না হয়, এ মোর বুকের ভোক
মনে মনে মুই একেনা আলো আকোং
সেই আলোখুনা আসলে আকে মোক।

'মানষিলা' কবিতাটি সমাজ সচেতনতার জীবন্ত দলিল। রাজনীতির দুর্বিপাকে শোষিত মানুষজনের করুণ কাহিনির ছবি কবিতার ভাষায় হাহাকার হয়ে ওঠে। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের ভাষা সনির্বন্ধ হয় অনুভবের আকাঙ্ক্ষায়।

আরও এমন কদ্দিন যে যাবে
কদ্দিনে আর পেট ভরেয়া খাবে?
কদ্দিনে আর নিজের কতা কবু
কদ্দিন আর বুদ্ধু হয়া রবু?
ভিকিরি উঠি ঘুরিয়া হয় খাড়া
এক নিস্টা এত্তোখুনা চাড়া।
মানষিগুলা নড়িচড়ি ওঠে
মানষিগুলা একটে খুনা জোটে।

এই উচ্চারণ তো নির্দিষ্ট কোন জনগোষ্ঠীর মানুষের জন্য নয়, শোষিত, নিপীড়িত নিম্ন মানব সমাজের। চারিদিকে শুধু তৃষ্ণার মাঝে এক শ্রেণির মানুষের লোভ, লালসা, শোষণ, চালাকিকে নগ্ন চেহারায় কবিতার শব্দবন্ধে ধরেছেন কবি নিখিলেশ রায়। 'কালনাত্তির কবিতা' কাব্যগ্রন্থের প্রত্যেকটি কবিতায় এই সচেতন ভাবনার দীপ্ত উচ্চারণ। আবার উত্তরণের আহ্বান তিনি রেখেছেন এবং দীর্ঘ সময় যাপনের প্রস্তুতিকে মাথায় রেখে সেখানে মা, মাটি সংলগ্ন হয়েছে শেকড়ের সন্ধানে।

নিজের ছাওয়ালা কাণ্ডো কাণ্ডো বোঝে কতা
বিরায় উমরা ঘর ছাড়ি — সউগ ছাড়ি
মাটি কান্দিলে বসি থাকিবার না পাই
আসুক হুড়কা, বাও-বাতাস বা ঝরি

এং করিয়ায় মাথা বাড়িবার ধরে
দেখার দেখি বিরায় আরো কত ঝনে
কত মরে কত ধর ধরি করে পুরুক .....
ভিতিরাত বসি উমরাও দিন গনে

পরবর্তীকালে শূন্য দশকে আমরা পেয়ে যাই আরেক কবি অভিজিৎ বর্মনকে। অসম্ভব অনুভবি এই কবির কবিতায় গ্রামজীবন, প্রকৃতির সৌন্দর্য, লালিত্য, মানুষের কথা, হাসি ঠাট্টা, জীবন রস উপচে পড়েছে। তার 'শাক তুলিনু বেছি কুছি' আর 'ঢেসা ধানের সমাই' কাব্যগ্রন্থ দুটিতে রাজবংশী শব্দ মঞ্জুরীর ভাঁড়ার হয়ে উঠেছে তার গভীরতার গুণে। ব্যঞ্জনাময় শব্দে অনুরণন ঘটেছে অনুভূতির। অতীত গৌরবের আহ্লাদ ভেসে ওঠে তার ব্যবহৃত শব্দের সমাহারে।

খাচারি কিনা আজারি করি পিতারি আনির যা
নাতারি পিতারি শাকের ভাজা খকরা দিয়া খা।
নাখিরি দিয়া কাখিড়ি খাটেক আখাত আকাড়ি দেক্
বোগোরি খাবার যাবোতে তুই নগদ নগরি নেক্।

আরেক নবীন কবি পীযূষ সরকার। ইতিমধ্যে তার কাব্যগ্রন্থ ''আমাছামা চান'', রাজবংশী ভাষা আকাদেমি পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে প্রকাশ পেয়েছে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে। সম্ভাবনাময় এই কবিতায় স্পষ্ট আধুনিকতার ছাপ। শূন্য দশক থেকে রাজবংশী ভাষায় কবিতা চর্চার যে বাঁক তার কবিতার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। কবিতায় কবির অনুভব, মননবোধ সেই সমাজ পর্যবেক্ষণের ভাবনাকে জারিত করেছেন। বিগত সময়ের ঝঞ্ঝা দীর্ণতা কাটিয়ে স্থির মননচিত্রের ছাপ কবিতাগুলির মধ্যে। আধুনিকতার জীবনমুখী সুর, স্ব-উচ্চারণে ভাবনার সম্প্রসারণ কবিতার শব্দবন্ধে ধ্বনিত হয়েছে। আগামী সময়ের পদধ্বনি তার কবিতায় শোনা যায়। যেমন —

আগিলা জনমে মুই পালাগান হইম
দুনিয়াদারির সউগ কাউরহাট্টি পার হয়া
রসিয়া ক্ষীরোলপুর,
আর সেই উদাং ডাবিরি ...
যেটিখুনা মুই মোক কুড়ি পাই চোং

যেটিখুনা সমে-সমে পিরিতির ঝুনঝুনাতি বাজে

ওটিখুনা জনম জনম ...

কিংবা

এইলা মুই আন্ধার পড়ি পড়ি জানিছোং
প্যাটের ভোক চিপি ধরি, ম্যাদেরা মুছি
ছিড়া স্বপনত ছিপটিপিন নাগাইতে নাগাইতে চখু খুইলচে মোর
না দেখিয়াও কয়া দিম — কার ভিতিরা কি;
কায় কোন রঙত ডুবি আছে ...

এইসব কবিতার ভাষা, মুখ থেকে যেমন আধুনিক রাজবংশী কবিতার গতিপ্রকৃতি বোঝা যায় তেমনি ধারাবাহিক বিবর্তনের ছবিটাও ধরা পড়ে এবং আগামী সময়ের পদধ্বনির উচ্চারণটাও ধ্বনিত হয়।

উপন্যাস, গল্প, কবিতার পাশাপাশি উল্লেখযোগ্যভাবে রাজবংশী সাহিত্য চর্চার অংশ বলা যায় প্রবন্ধ সাহিত্য। ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য নিয়ে বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা সহ গ্রন্থে প্রকাশ পায়। আত্মসচেতনতা, জাতিসত্তার উন্মোচন সহ ভাষা বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধে রাজবংশী ভাষা সাহিত্য চর্চার বিষয়টি সমৃদ্ধ হয়েছে। সমাজ অর্থনীতি এমনকি রাজনৈতিক বিষয়গুলিও আধারিত হয়েছে বিভিন্ন প্রাবন্ধিকের কলমে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই নাম করতে হয় হরিমোহন বর্মনের নাম। তিনিই প্রথম ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে 'উত্তরবঙ্গ' পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন "সোচায় সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দ্যাশ!" নাম করতে হয় ড. গিরিজাশংকর রায়, নগেন্দ্রনাথ রায়, ড. গিরিন্দ্রনাথ রায়, ধর্মনারায়ণ বর্মা, ড. নিখিলেশ রায়, ড. দীপক কুমার রায়, ড. দ্বীজেন্দ্রনাথ ভকত, হরিপদ রায়, ক্ষিতীন্দ্রনাথ সরকার, বাচ্চামোহন রায় প্রমুখ অনেকের নাম। সুজন বর্মন, ড. ধীরেন্দ্রনাথ দাস, বজলে রহমান, ভগীরথ দাস, ইন্দ্রমাধব দাস সহ আরও অনেকে রাজবংশী ভাষা-প্রবন্ধ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। বলা যেতে পারে প্রবন্ধ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সামগ্রিক সাহিত্য সংস্কৃতি ধারাটি উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রবন্ধ সাহিত্যের দু-তিনটি রাজবংশী পত্রিকাও প্রকাশ পাচ্ছে — উদিস (সম্পা-নিখিল বর্মা), লোক উৎস (সম্পা-পরিমল বর্মন)।

রাজবংশী ভাষায় নাট্য রচনার একটি পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছে। ভাষা-সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে নাট্য সাহিত্যের ভূমিকাটিও অস্বীকার করা যায় না। এমনিতেই রাজবংশী সমাজে লোকনাট্যের পরিসরটি সুবিস্তৃত। সুদূর অতীতকাল থেকে যা অব্যাহত ছিল। যদিও বিগত কয়েক দশকে দোতরাডাঙ্গা, পালাটিয়া কিংবা কুশানের পরিবেশটি অস্তমিত প্রায়। তবুও এই ধারায় কিছু কিছু সংস্থা, গোষ্ঠী পালাগানের এই ধারাটি ধরে রেখেছেন। ইদানীং নাট্যধর্মী কিছু পালাকে অবলম্বন করে কিছু নাট্যসংস্থাও তৈরি হয়েছে। নাট্যকার হিসাবেও দু'একজন পরিচিতি পেয়েছেন। সবার আগে নাম করতে হয় ভাটিবাড়ী, আলিপুরদুয়ার জেলার গুণেশ্বর অধিকারীর নাম। তিনি একাধিক নাটকের রচয়িতা শুধু নন তাঁর নির্দেশনায় 'ময়নার চখুর জল', 'ঘরজেয়া'র মত নাটকগুলি উত্তরবঙ্গ ও আসামে জনপ্রিয় হয়। বিশেষ করে 'ময়নার চখুর জল' রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করে। ধুপগুড়ি এলাকায় তপন রায়, মহেশ রায়, সুশীল রায়, কৃষ্ণবিহারী বর্মন সহ বেশ কয়েকজন নাট্য রচনার সঙ্গে যুক্ত। মনয়াগুড়ি থেকে দীনেশ রায় 'রাবান' সহ বেশ কয়েকটি নাটক রচনা করেছেন। মেখলিগঞ্জ, চ্যাংরাবান্দা থেকে শচীমোহন বর্মন এই নাট্যচর্চার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়ে আছেন। গুণেশ্বর অধিকারীর 'ময়নার চখুর জল' নাটকে পণপ্রথা মুখ্য বিষয় হয়ে রাজবংশী সমাজের সংস্কৃতির পরিবর্তনের দিকটি তুলে ধরেছেন। কারণ অতীতে রাজবংশী সমাজে 'কন্যাপণ' প্রচলিত ছিল। তাঁর 'ঘরজেয়া' নাটকে ঘরজামাই-র যন্ত্রণা, অপমানের কাহিনিকে বর্তমান প্রেক্ষিতে তুলে ধরেছেন। অতীতে রাজবংশী সমাজের ঘরজেয়া বিয়ে অর্থাৎ ঘরজামাই থাকা বহুল প্রচলিত একটি প্রথা ছিল। তাঁর 'জোনাকির সংসার' নাটকে ধরা পড়েছে রাজবংশী সংস্কৃতির একটি অনবদ্য বিষয় 'চোর চুরনীর' আখ্যান। যা মূলতঃ লোকনাটকের একটি বিষয় ছিল। অতীতের লোকটানকের বিষয়ই বর্তমান লোকনাটকের অংশ হয়ে উঠেছে। রাজবংশী সমাজের লোকনাটকের পরিসরটি বিস্তৃত। সেটা চোরচুরনী থেকে মেচেনী সবেতেই লোকনাটকের উপাদান বিদ্যমান। দোতরা, কুশানকে ঘিরে তো অজস্র ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের জন্ম। স্বাভাবিকভাবে নাট্যরচনার বিষয়টি রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির এক বিশেষ ঘরানা।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাকে ঘিরেই রাজবংশী ভাষায় সাহিত্য চর্চার পরিসরটি সম্প্রসারিত হয়েছে। তাদের এই উদ্যোগ এবং প্রয়াসের মধ্যেই আজকের রাজবংশী ভাষা সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রটি বিরাজমান। অনেক বাধাবিপত্তি, সামাজিক, রাজনৈতিক চাপ, বিভ্রান্তি ও বক্তব্যকে অতিক্রম

করতে হয়েছে তাদের। তাই সাহিত্য চর্চার প্রসঙ্গে এই পত্রিকাগুলির নাম গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। হরিমোহন বর্মনের 'উত্তরবঙ্গ' পত্রিকা যেমন, তেমনি জলপাইগুড়ি থেকে প্রকাশিত সুবীররঞ্জন বিশ্বাস সম্পাদিত 'উত্তরবাঙলা' পত্রিকা কিংবা কলীন্দ্রনাথ বর্মনের 'নয়া ডেগর', বিনোদবিহারী বর্মনের 'জাগরণী', 'পোঁহাতী', 'দুন্দ', 'উজানী'। ধর্মনারায়ণ বর্মার পৃষ্ঠপোষকতায় 'রায়ডাক', নরেন দাসের উদ্যোগে 'বাঘধেনুক', নিখিলেশ রায়ের সম্পাদনায় 'ডেগর' রাজবংশী ভাষা আকাদেমির 'ভোগা', অজিত কুমার বর্মার 'মনসূয়া', নির্মল বর্মার 'উদিস' — এইসব পত্রিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। গোষ্ঠীচেতনাকে অতিক্রম করে সমাজ ভাবনার বিষয়টি যেমন গুরুত্ব পেয়েছে তেমনি সংস্কৃতি চর্চা তথা সমকালীন সমাজের উত্থান পতন, ঘাত-প্রতিঘাত সমূহকে লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরার প্রয়াস তারা নিয়েছিলেন। বিগত শতাব্দীর ষাট-সত্তর দশক থেকে রাজবংশী সমাজ জীবনের যে পরিবর্তনের ধারা, জীবন-জীবিকার লড়াই, ঝড়-ঝঞ্ঝা সমস্ত কিছুকে ধারণ করে ইতিহাসের উপাদান হিসাবে ধরে রেখেছেন। সর্বোপরি রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের যে পথ পরিক্রমা তারও বৃত্তান্ত মনন প্রক্রিয়ায় তুলে ধরেছেন। যা রাজবংশী সমাজ জীবন তথা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জরুরি বিষয় শুধু নয় জাতিসত্তার উন্মোচন ও বিকাশের পক্ষেও আবশ্যক ছিল। সঙ্গে সাংস্কৃতিক উপাদানের অতীত গৌরব উদ্ধার ও ভবিষ্যৎ সময়ের জন্য সংরক্ষণ, প্রসারের যে পরিসর তাও সাহিত্যচর্চার আবহে সংবৃত্ত করতে পেরেছেন। যা সামগ্রিকভাবে বাঙলার তথা ভারতীয় সংস্কৃতির অনন্য সম্পদ। কারণ ভারতীয় সংস্কৃতির বহুত্বে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। স্বাভাবিকভাবে একটি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষায় সাহিত্য চর্চার বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এর মধ্যেই এই জনগোষ্ঠীর পথ পরিক্রমা, উত্তরণ, সমৃদ্ধি ও সম্ভাবনার বীজ লুকিয়ে আছে। অন্যান্য জনগোষ্ঠী অপেক্ষা প্রাগসর এই জনগোষ্ঠীর অতীত সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে যেমন প্রাচীন ও মধ্যযুগের অনুবাদ রচনা ও লোক সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে পাই তেমনি বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত, সংগৃহীত এবং সংকলিত পুঁথি গ্রন্থ থেকে এই জনগোষ্ঠীর সমাজ সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশদে জানতে পারি। স্বাধীনোত্তর সময়কালে এই জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক পরিচয় এই সাহিত্যচর্চার বিন্যাসে গ্রন্থিত হয়েছে যা সমাজ বিজ্ঞানের ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ। সাংস্কৃতিক বিবর্তনের প্রেক্ষিতেও যা ভবিষ্যৎ সময়ের জন্য জরুরি।

তথ্যসূত্র :

১. খা চৌধুরী, আমানত উল্লা; কোচবিহারের ইতিহাস (১ম খণ্ড), গন্ধর্বনারায়ণের (বংশাবলী, পত্র সংখ্যা পাদটীকা নং - ৩২) পৃষ্ঠা - ৮৬
২. রায়, শচীন্দ্রনাথ; সাহিত্য সাধনায় রাজন্য কোচবিহার, এন. এল. পাবলিশার্স, শিলিগুড়ি, ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৩, পৃষ্ঠা - ১৪
৩. শর্মা, নবীন্দ্র চন্দ্র (সম্পাদিত); দরঙ্গ রাজবংশীবলী (সূর্যকান্ত দৈব বিরচিত), পৃষ্ঠা - ৬৬
৪. ঐ, পৃষ্ঠা - ৬৮
৫. রায়, শচীন্দ্র নাথ রায়; সাহিত্য সাধনায় রাজন্য শাসিত কোচবিহার, এন. এল. পাবলিশার্স, শিলিগুড়ি, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৩, পৃষ্ঠা - ১৩
৬. সেন সুকুমার; বঙ্গভূমিকা; পৃষ্ঠা - ৪০
৭. রায়, নিহাররঞ্জন; বাঙালীর ইতিহাস (২য় খণ্ড), সাক্ষরতা সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ৬২৩
৮. সেন, দীনেশ চন্দ্র; বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১৩১৫, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ১৩৪
৯. বর্মা, সুখবিলাস; জাগ গান, আর্ট পাবলিশিং, কল - ৯, ২০১০ (২য় সংস্করণ), পৃষ্ঠা - ৭৯
১০. ঐ, পৃষ্ঠা - ৮১
১১. ঐ, পৃষ্ঠা - ৫১
১২. বসুনীয়া, নারায়ণ চন্দ্র; গোরক্ষনাথের গান লোকপুরাণের আঙিনায় রাজবংশী জীবন কথা, গ্রন্থবিকাশ, কল-৭৩, ২০১৪, পৃষ্ঠা - ৫০-৫১
১৩. ভট্টাচার্য, আশুতোষ; বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, আলোচনা সংস্করণ, ১৯৬২, পৃষ্ঠা - ৩৮৫
১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত; বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড, সংস্করণ ১৯৬৬, পৃষ্ঠা - ৩৭৯
১৫. সেন, উমা; প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সাধারণ মানুষ (সংস্করণ ১৯৭১), পৃষ্ঠা - ১৫৪
১৬. ঐ, পৃষ্ঠা - ১৬২
১৭. বন্দ্যোপাধ্যায় অসিত; বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ৩য় খণ্ড, সংস্করণ ১৯৬৬, পৃষ্ঠা - ৩৮৯
১৮. চৌধুরী, ভূদেব; বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (প্রথম পর্যায় : সংস্করণ - ১৯৬৫), পৃষ্ঠা - ৭৫
১৯. সেন, সুকুমার; বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃষ্ঠা - ৩৬০
২০. ভট্টাচার্য, সুরেশ চন্দ্র (সম্পাদনা); কবি জগজ্জীবন বিরচিত মনসামঙ্গল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০, পৃষ্ঠা - ২৯০
২১. বর্মা, ধর্মনারায়ণ ও মান্তা, ধনেশ্বর (সম্পাদনা); কামরূপ কামতা কুচবেহার রাজ্যের ইতিহাস, তুফানগঞ্জ, কুচবিহার ২০০৫, পৃষ্ঠা - ৩৬০
২২. ঐ, পৃষ্ঠা - ২৪৫
২৩. প্রচলিত

২৪. চট্টোপাধ্যায়, বিমল চন্দ্র; উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত ভাওয়াইয়া ও চটকা, ১ম প্রকাশ ১৯৯২, পৃষ্ঠা - ১১৫

২৫. ঐ, পৃষ্ঠা - ১১৩

২৬. ডেগর - ৪, ২০০৬, রায়, নিখিলেশ (সম্পাদক), নর্থবেঙ্গল আকাদেমি অব কালচার, শিবমন্দির, কদমতলা, দার্জিলিং, ৭৩৪০১৪